বেগম রিজিয়া

অমরেন্দ্র দাস

শ্রীগুরু পাবলিকেশন
২৩এ নূর আলি লেন, কলিকাতা-১৪

প্রথম (শ্রীগুরু) প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৭
জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশ করেছেন : শ্রীশিউলি দাস, ২৩এ, নুর আলি লেন, কলিকাতা-১৪
ছেপেছেন : রূপা প্রেস, ২০৯/এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

বেগম রিজিয়া

উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি

সবাই জানতো রিজিয়া সুলতানা। ভারতে প্রথম নারী সুলতানা, অবশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে নয়। কিন্তু সে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতো, পুরুষের বেশে সিংহাসনে বসতো, রাজ্যে বিয়ে শাদী হলে তার হুকুম নিতে হতো কিন্তু কেন? তবে কি সে বিয়ে শাদীর ওপর ক্ষুব্ধ ছিল? এই প্রশ্নগুলি মনে হতে ভারতের প্রথম নারী সুলতানার ওপর পড়াশুনায় মন দিই। আর তারপরই বেরিয়ে আসে সুলতানা রিজিয়ার জীবনের নানান কাহিনী। রিজিয়া শুধু সুলতানাই হয় নি, বেগমও হয়েছিল। আর মনটি ছিল একটি কোমল নারী মন, যা নারীর আসল ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু বাইরের চেহারায় কখনও তা প্রকাশ করতো না। একি শুধু সেই ইতিহাসের নারী, না আবহমানকাল ধরে সেই নারীরই একরূপ। যে প্রেমিকের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে কখনও দ্বিধা করেনি। রিজিয়াও তাই করেছিল। তাই সেই রিজিয়াকে নিয়ে এই উপন্যাসের প্রস্তাবনা। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা যায়, একসময়ে বাংলায় নাটক লেখা হয়েছিল 'সুলতানা রাজিয়া' নামে কিন্তু সে সুলতানার কাহিনী, বেগমের নয়। মনে হয় এই প্রথম বেগম রিজিয়াকে নিয়েই উপন্যাস লেখা হল।

'Those who scrutinize her actions will find no fault but that she was a woman.'

(Birggs' Ferishta, i,217-8)

'দিল গুমান দারদ কি হশীদে অস্ত্
রাই-ই ইশ্কৃয়া
শমবা ফানুস পনদারদ্ কি পিনহাস
করদে অস্ত্।'

আসমানে নীল নীল ছায়া। নীলের সমারোহের মাঝে সাদা সাদা মেঘের আলপনা। সলমা-চুমকির মতো রূপোলী জরির বুটি জ্বলছে আসমানে নীলের সমারোহে। রূপোলী আলোর মায়ামোহ বিস্তার দিগন্তের অসীম কূল ছাপিয়ে। এক একটি তারা খুব উজ্জ্বল হয়ে তার রূপের ছটায় নিস্তব্ধ প্রহরীকে চমকে দিয়ে টুপ করে মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যের মাঝে। মাঝে মাঝে বাতাসের স্নিগ্ধ পরশ ছুটে আসছে প্রাসাদ অলিন্দে। কিন্তু সে পরশ অনুভবের সাড়া জাগাবার আগেই কোথায় কোন অতলান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

রিজিয়া তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে নিশ্চুপ রাতের দিকে। এমনি করে রাত্রিকে উপভোগ করার সময় তার জীবনে কখনও হয়নি। জীবনে কখনও আসেনি এমনি একটি অশুভ মুহূর্ত। হ্যাঁ অশুভ মুহূর্ত। অশুভ ছাড়া আর কি বলবে? এই রাত্রি তার কাছে আজকে সুষুপ্তির কোলে মখ্‌মলের কোমল শয্যায় বিশ্রাম নিতে দেয় নি, জাগিয়ে রেখেছে। দেহের মধ্যে পুরে দিয়েছে দস্যুর ছুরিকা। যে কথাটা সবসময় সে একান্ত গোপনে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে জল্লাদ যেন হুঙ্কার দিয়ে সেই কথাটাই বার বার উচ্চারণ করেছে, 'তুমি নারী তুমি রমণী। পুরুষকে ভালবেসে দিওয়ানা হয়ে যাওয়ার জন্যেই তোমার জন্ম।'

প্রাসাদের নহবত চূড়ায় কিছুক্ষণ আগে রাত্রি দ্বিপ্রহরের বার্তা ঘোষিত হয়েছে। নিস্তব্ধ প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে তারই প্রতিধ্বনি সহস্র হয়ে ঢেউ সৃষ্টি করে দূর-দূরান্তে মিলিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে খোজা-প্রহরীর পায়ের শব্দ ভেসে আসছে এই নিস্তব্ধ রাত্রে। আর কি কোন শব্দ নেই? রিজিয়া বিস্ময়ে ভাবলো। কান পাতলো বাতাসের বুকে। নরনারীর কোন গোপন অভিসার সুলতানার অগোচরে এই রাতের রহস্যে কথা কয়ে ওঠে না, অন্যায় করে না, সুলতানার নিষেধ বাক্য অমান্য করে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করে না! এসব কথা ভেবেই রিজিয়া কেমন যেন বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গেল। তবে কি রিজিয়াকে বুঝতে হবে—এখানে হৃদয় বড় না। মানুষের ধর্ম বড় না। আইন বড়। জল্লাদের খড়্গ বড়। সে সমস্ত নগরীতে ঘোষণা করে দিয়েছে কেউ বিয়ে-শাদী করতে পারবে না। করলে সুলতানার হুকুম চাই। না হলে নিশ্চিত কারাগার বাস। কিন্তু কেউ কি জানে না সুলতানা রিজিয়া এ হুকুম দিয়েছে কেন? জানে, জানে সবাই জানে। কেউ প্রকাশ করে না রিজিয়ার ভয়ে।

কেউ প্রকাশ করে না রিজিয়ার ভয়ে তাদের প্রণয়কাহিনী। কিন্তু এই রাতের নিভৃতলোকে সুলতানা রিজিয়া জেগে আছে কেউ তো জানে না। তবে কেন তাদের গোপন প্রেমালাপ নিস্তব্ধ প্রহরে ফিসফিসিয়ে অনুচ্চারিত হয়ে ওঠে না! যার শব্দ শুনে রিজিয়ার হৃদয়ের স্তরে একটি প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়ে যায়। পৃথিবীতে আইন বড় না, হুকুম বড় না। হৃদয় বড়। একটি হৃদয়ের জন্যে আর একটি হৃদয়ের ব্যাকুলতা সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে চূর্ণ করে দেয়!

সকলে জানে রিজিয়া ন্যায়পরায়ণা, বিদ্যোৎসাহিনী, দয়াশীলা রমণী। কঠোর এবং নির্মম সুশাসক। রাজদরবারে বসে কঠোরভাবে অপরাধীর বিচার করে। সেখানে নারীর কোমলতা নেই। নারীর মনের কোমল বৃত্তিগুলিকে চূর্ণ করে দিয়ে পুরুষের দৃঢ়তাই রিজিয়া অভ্যাস করেছে। পুরুষের বেশে যখন বিজিয়া রাজদরবারে বসে কাজীর মত বিচার করে, সম্মুখে বসে থাকা আমীর-ওমরাহরা দেখে চমকে ওঠেন। তাঁরা ফিসফিস করে পরস্পরে রিজিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করেন ; রিজিয়া বুঝতে পারে তাঁদের মনোভাব। মনে মনে হাসে সে। কি তাঁরা আলোচনা করেন তাও জানে রিজিয়া। এঁরাই একদিন নারীর বশ্যতা স্বীকার করতে চাননি। দিল্লীর সিংহাসনে একটি নারীর আসন হবে অলঙ্কৃত ! এ কথা চিন্তা করে তাঁরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। আর তার জন্যেই তৈরী হয়েছিল—'চল্লিশের চক্র'।

কিন্তু আজ ? যে নারীর হাতে দিল্লীর সিংহাসন, সে নারী যে কোমলস্বভাবা নারী নয়—তা প্রমাণ হয়ে গেছে। বরং পুরুষের দৃঢ়তা, কঠোর মনোভাব—তার চেয়েও রিজিয়া প্রমাণ করেছে যে সে পুরুষকে ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে পারে। সে পুরুষ না, নারী না—দিল্লীর সিংহাসনের একজন সত্যিকারের সুলতানা। পিতা আলতামাসের সম্মান সে রেখেছে। পিতার ভবিষ্যৎবাণী সে সফল করেছে। একটি কথা আজও মনে আছে রিজিয়ার। সে তখন ছোট। পিতা আলতামাস গোয়ালিয়র যুদ্ধ জয় করে প্রফুল্লচিত্তে দিল্লীতে প্রবেশ করলেন। প্রধানা মহিষীর প্রাসাদে এসে দেখেন পিতার জয়লাভে স্নেহময়ী রিজিয়ার মুখে এক অপূর্ব রাজভাবের সমাবেশ হয়েছে। আলতামাস কন্যার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করে খুশী হয়ে রাজসচিব তাজুলমালিক মাহমুদকে ডেকে আদেশ দিলেন—রাজদপ্তরে লিখে রাখো, এই কন্যাই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এবং আমার মৃত্যুর পর সিংহাসন অলঙ্কৃত করবে।

সিংহাসন রিজিয়া পেয়েছে বটে। পিতার ভবিষ্যৎবাণী সফলও হয়েছে। কিন্তু সিংহাসন পাওয়ার জন্যে যে কষ্ট তাকে করতে হয়েছে সে কথা কোনদিনও সে ভুলবে না। এবং আজ পর্যন্ত তাকে গভীরভাবে চিন্তা করে সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। বিদ্রোহীদের শিরে পদযুগল স্থাপন করে তবে তাকে সিংহাসন টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। মুহূর্তে এতটুকু শিথিল মনোভাব দেখালেই পশ্চাতে সম্মুখে শত্রু নিশান তুলে অপেক্ষায় আছে।

কি নিদারুণ তার এই পরীক্ষা ? সে ভুলে যেতে চেয়েছে সে নারী নয়। রমণী নয়। সে পুরুষ। পুরুষের চেয়েও কঠিন। বজ্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কিন্তু তার এই অসামান্য যৌবন তাকে তা ভুলতে দেয়নি। প্রকৃতির নিয়মে, মানুষের ধর্মে, রমণীর দেহে যে প্রকাশগুলো একটি অপূর্ব সময়ে জেগে ওঠে, তাকে সৌন্দর্যময়ী করে দেয়, রিজিয়ার দেহেও আল্লা সে উপহার না দিয়ে পারে নি। কিন্তু কেন এই উপহার ? কে চেয়েছিল এই উপহার ? 'রিজিয়া রমণী—এ কথা যে বার বার সে বিস্মৃত হতে চেয়েছে।

বার বার সে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে—রমণীর সৌন্দর্য তাকে দিও না। সে দিল্লীর সুলতানা। সিন্ধুনদ থেকে জাহ্নবী পর্যন্ত সুবিশাল আর্যাবর্তের একচ্ছত্র

অধিশ্বরী সে। তাকে কঠোর হস্তে রাজ্য পরিচালনা করতে হয়। তার জন্ম দিল্লীর সিংহাসনের জন্য। তার জন্ম কোন পুরুষের পূজার নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য নয়। পুরুষের সুদৃঢ় আলিঙ্গনে পরশে পরশে হৃদয় রাঙা হয়ে উঠবে সে রকম মন নিয়ে তার জন্ম হয়নি। সে অশ্বারূঢ় হয়ে শত্রু নিধনে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ বিজয়ে ছুটবে। রণক্ষেত্রে অসির ঝন ঝনানিতে পৃথিবী কাঁপিয়ে শত্রুকে দ্বিখণ্ডিত করবে—এইজন্য তার জন্ম। সেইজন্যে সে কোন সময়ে নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে চমকিত হয় নি। দীপ মুকুরে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে খুশীর জোয়ারে হৃদয় সমুদ্রে তুফান তোলেনি। পাছে তার মন শিথিল হয়ে যায় এইজন্যে সে কখনও সহজে পুরুষের বেশ দেহ থেকে খোলেনি। পাছে তার মনে কোন কথার আলোড়ন জাগে সেইজন্যে সে সারাদিন ধরে পরিশ্রম করেছে। তারপর ক্লান্ত-শ্রান্ত পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে শয্যার ওপর অঘোর সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। পাছে নিস্তব্ধ রাত্রে নারীর হৃদয়ের আকুতি চীৎকার করে কেঁদে ওঠে, বিদ্রোহী হয়ে রিজিয়াকে প্রতিজ্ঞা থেকে টলিয়ে দেয় সেইজন্য কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে চিন্তাকে এড়ানোর জন্যে সে শয্যার কোলে মুহূর্তের মধ্যে নিদ্রার বশীভূত হয়েছে।

কিন্তু আজ সবকিছু সাবধানতা, কঠোরতা, যুদ্ধ, শাসন, বিচার, দরবার, বিদ্রোহ সব লয় করে দিয়ে প্রকাশ্য দরবারে সবার সমক্ষে একজন দৃঢ়মনে তাকে জানিয়ে গেছে সে নারী। সে যতো চেষ্টা করুক পুরুষের মতো কঠিন মনে রাজ্য-পরিচালনা করার। তবু সে নারী। একটি কেন, সহস্র পুরুষের হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে পারে। তাকে কেউ জোর করে অধিকার করে বুকে চেপে ধরলে হৃদয়ের শোণিত তপ্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু লোকটা সাহস পেল কেমন করে? প্রকাশ্য রাজসভায় আমীর-ওমরাহ, মন্ত্রী, সেনাপতি, উচ্চকর্মচারী, মোল্লাকাজী, স্ব-স্ব আসনে বসে আছেন। প্রহরীরা স্ব-স্ব স্থানে পাহারা দিচ্ছে তাদের কোষবদ্ধে অসি। ঘাতক একপাশে অপেক্ষা করছে হুকুমের অপেক্ষায়। তার হাতের খড়্গে সূর্যের রশ্মি। মাঝে মাঝে সুলতানাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

উন্মুক্ত রাজসভা। রিজিয়া পুরুষের বেশে উচ্চ সিংহাসনে বসে সমস্ত রাজদরবারের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার মুখে দৃঢ়তার ছাপ। দৃষ্টিতে মেয়েলি-ছাপ এতটুকু নেই। দৃষ্টির মধ্যে একটি ক্রুদ্ধভাব জাগানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ঠোঁটের কোণে মৃদু- হাসির হীরার ঔজ্জ্বল্য। সেই হাসিটুকু লক্ষ্য করার জন্যে আমীর-ওমরাহদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি রিজিয়ার ওপর। রিজিয়া বুঝতে পারে হাসা তার অন্যায়। কিন্তু না হেসেও সে পারে না। রাজদরবারে বসে প্রফুল্লভাব জাগিয়ে না রাখলে রাজ-প্রতিনিধিদের অসম্মান করা হয়। পিতা আলতামাস যখন রাজদরবারে বসতেন, রিজিয়া দেখেছে। তিনি হাসিমুখেই এক একটি কঠিন বিচার সমাধা করতেন। রাজ-প্রতিনিধিরা অবাক হয়ে তাঁর বিচার লক্ষ্য করতেন আর শিউরে উঠতেন। তাঁরা ঐ হাসিকে ছুরি বলতেন। রিজিয়া হাসিটিকে ছুরি করবার জন্যে, শাণিত

করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিন্তু তা হয়নি। মেয়েলি হাসিতে যে বিজলীর চমক, সরাবের মাতোয়ারা থাকে, তা তার হাসিতে ফুটে উঠেছে। সতৃষ্ণনয়নে লুব্ধ দৃষ্টিতে যে আমীর-ওমরাহরা লক্ষ্য করে তা দেখে সে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়—কিন্তু হাসি লুকিয়ে সে গম্ভীর হতে পারে না। হাসি লুকোলে পিতার সম্মান সে রক্ষা করতে পারবে না। সিংহাসনের ইজ্জত গরিবী-আশ্রয়ের মতো পথের ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। দিল্লীর মহামূল্য সিংহাসনের রোশনাই ম্লান হলে তাদের দাসবংশের পূর্বপুরুষরা কবর থেকে উঠে এসে তাকে শাসন করবে।

কিন্তু এই হাসিই তার রাজ্যে অগণিত মানুষের হৃদয়শোণিতে তুফান তুলেছে। সে খবর সে জানতো। জানতো আমীর-ওমরাহ, মন্ত্রী, সেনাপতি, তার হৃদয় অধিকার করবার জন্যে তার পাশে পাশে ছায়ার মত ফিরছে। এক একসময় ভাবে রিজিয়া, সে অপরাধীকে এত কঠোর দণ্ডাজ্ঞা দেয়, মন্ত্রী,সেনাপতিদের সঙ্গে কখনও কোমল ব্যবহার করে না, প্রাসাদের কোন কর্মচারী তার কাছ থেকে এতটুকু দয়া পায় না, ভালবাসার চোখে, প্রেমের চোখে, মহব্বতের রোশনাই জেলে গোলাবী নেশাসক্ত চোখে কখনও কারও দিকে এতটুকু দৃষ্টি হেলায় নি—তবু কি আছে তার দেহের মধ্যে যার জন্যে সমস্ত দিল্লীর মানুষ তার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করতে চায়? জল্লাদের খড়্গের তলায় মাথা দিতেও ভয় পায় না?

রিজিয়া নিজের ভাইদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কথা ভাবে। পিতা বেঁচে থাকতেই তারা সেরাজি সরাবের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে ফুলের মতন টুকরো টুকরো নরম কোমল মেয়েলী দেহগুলো নিয়ে দিনরাত তাদের নিঙড়ে রস বের করবার চেষ্টা করেছে। নগ্ন, অর্ধনগ্ন নিটোল দেহগুলোর বিচিত্রখাঁজে যে রহস্যের আনাগোনা থাকে সেই রহস্যকে আরও প্রকট করে তোলবার জন্যে তাদের নাচিয়ে—সেরাজি সরাবের নেশায় মাতোয়ারা করে বাঁদীগুলোর, নর্তকীগুলোর দেহের রহস্য জিহ্বার আস্বাদে লেহন করেছে। রিজিয়া তখন ছোট। সে মাঝে মাঝে লুকিয়ে ভাইদের এই প্রমোদ ক্ষেত্রে চোখ লাগিয়ে দেখেছে। দেখেই চোখ বন্ধ করে পালিয়ে এসেছে। শিউরে উঠেছে তার দেহ। যৌবন তখন তার সবে দ্বারে এসে কুর্নিশ জানিয়েছে। তার দেহের মেয়েলি খাঁজগুলি আস্তে আস্তে অলঙ্কারের জলুস নিয়ে অসামান্য হয়ে উঠেছে। ভরন্ত হয়ে উঠেছে বুক। দুধশুভ্র সমুদ্রের ফেনার মতো বুকের পেলবতায় জেগে উঠেছে রক্তিমতার ছোঁয়াচ। লজ্জারুণ হয়ে উঠেছে শরীরের কোন কোন অংশ। চটুল ভঙ্গি। সাবলীল গতিবেগে চোখের চাউনিতে জেগে উঠেছে মদিরচ্ছটা। সেইজন্যেই দেখতে গিয়েছিল রিজিয়া। শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে। তার ভায়েরা দিনের পর দিন বাজনার তালে তালে নর্তকীর পায়ের ঘুঙুরের শব্দ শুনে আর সরাবের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে কি আনন্দ পায় দেখবার জন্যে সে লুকিয়ে চোখ দিয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে তাকে এই দেখতে হবে সে ভাবেনি। পিতা কেন নিষেধ করেন এবার সে বুঝতে পেরেছে। রমণীর নগ্নদেহ যে এমনি প্রকাশ্য প্রমোদঘরের আলোর নীচে এমনি প্রকটভাবে ধরা দিতে পারে—রিজিয়া

কখনও ভেবে পায়নি। তাড়াতাড়ি সে তার বুকের ওড়নার ওপর হাত দিয়ে চাপা দিয়েছে। কেউ বুঝি তার আসমানি সাটিনের সালোয়ার কামিজ টেনে খুলে দিচ্ছে, এমনিধারা ভয়ে ভয়ে সে চেপে ধরেছে তার সালোয়ার, কামিজ, ওড়না।

পিতা আলতামাস ভাইদের বার বার কেন নিষেধ করেন—এইবার সে বুঝতে পেরেছে। নারীর যৌবনের তপ্ত নিঃশ্বাসে পুরুষের দেহের সমস্ত পৌরুষটুকু নিঃশেষ হয়ে যায়। পুরুষের রক্তে থাকবে বীরের সাহস, হস্তীর দাপট, অশ্বের দৃঢ়তা—সেইসব শক্তি দুর্বল হয়ে যায় একমাত্র বিলাসের পঙ্কে অবগাহন করে নারীর যৌবন দেহের ছোঁয়াচ নিলে। পিতা আলতামাস মুসলমান স্থলতান হয়েও উচ্ছৃঙ্খলতাকে ঘৃণা করতেন।

না'হলে পূর্বপুরুষদের গল্প মায়ের কাছে শুনেছে রিজিয়া। প্রায় অধিকাংশ স্থলতানই বিলাসের পঙ্কে অবগাহন করে নারীর লালসার মধ্যে বন্দী হয়ে রাজ্য হারিয়েছে। মুসলমান সমাজের ওপর কলঙ্কের কালিমা লেপে দিয়ে আলবারী তুর্ক-জাতিকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। মুসলমান স্থলতানদের এই ঘৃণ্য জীবনের কথা চিন্তা করলে এক একসময় শিউরে উঠতে হয়।

সম্মান তাদের কাছে কিছু না। কর্তব্য তাদের জলাঞ্জলি যায়। হিংসা, দ্বেষকে বুকে বেঁধে অতর্কিতে বুকে ছুরি বসিয়ে একবার ছিনিয়ে নিতে পারলেই হল রাজ্য। তারপর নাচঘর, সেরাজি সরাব, নর্তকীর ললিত ছন্দে ঘুঙুর নিক্কণ। খুবসুরত লেডকীর যৌবনকে বসোরাই গোলাপের মতো মুঠিতে নিয়ে নিষ্পেষিত করতে পারলেই হল। রাজকোষের আসরফি দুহাতে বিলিয়ে দিয়ে—মুক্তার কণ্ঠহার গলা থেকে খুলে জগতের সেরা সুন্দরীদের পরিয়ে দিয়ে বিলাসের পঙ্কে অবগাহন করতে পারলেই মুসলমান স্থলতানরা শ্রেষ্ঠ। মায়ের কাছে বসে সে সব গল্প সেদিন শুনে মনে মনে সে মুসলমান স্থলতানদের ঘৃণার চোখেই দেখেছে। পরিণত বয়সে আজকে দিল্লীর স্থলতানা হয়ে সে তাই বিলাসী পুরুষদের এড়িয়েই চলে। যাদের মধ্যে সে এতটুকু এমনি ধরণের বিলাস দেখে তাদের সে কখনও রাজ্যের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে না। তবে সামনে কেউ কিছু না করলেও গোপনে শুনতে পায়, আমীর ওমরাহ, মন্ত্রী, সেনাপতি, সামন্তদের মধ্যে এমনি ধরণের বিলাস মাঝে মাঝে মাত্রাধিক্য হয়ে ওঠে।

সংযম রক্ষা করে রিজিয়া। সে রমণী। গান, বাজনা, নাচ, সরাব তার কাছে আনন্দের সামগ্রী নয়। কিন্তু পুরুষেরা একটু আধটু এসব না করলে বাঁচবে কেমন করে? বিশেষ করে রমণীর চটুলভঙ্গি, যৌবনের অপরূপ লীলায়িত ছন্দ, তাদের দেহের শোণিতে আগুন জ্বালে। যুদ্ধজয়ী যোদ্ধাদের ক্লান্তি নিবারণ করতে এইসব উপকরণই যথেষ্ট। সেইজন্যে তার আদেশ আছে যুদ্ধজয়ে ফিরে এলে তার রাজ্যের সবাই আনন্দ করবে কিন্তু মাত্রাধিক্য নয়।

কিন্তু এ আদেশ থাকা সত্ত্বেও আমীর ওমরাহরা স্থলতানাকে উপেক্ষা করেই আলাদাভাবে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। রিজিয়া বাঁধা দেয় না এইজন্যে যে বিদ্রোহী হবার আকাঙ্খা আছে তাঁদের। তবে রিজিয়ার ভায়েরাও এদের সঙ্গে যোগ

করে তাঁদের আরও উত্তপ্ত করে তোলে। রিজিয়ার রাজ্যে শৃঙ্খলা থাকুক, শান্তি বিরাজ করুক, তার ভায়েরা কখনও তা চায় না।

রিজিয়ার দৃঢ়মনের রাজ্য পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার লোক সমস্ত রাজ্যের কোথাও ছিল না। রিজিয়া অপূর্ব কৌশলে বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যে সুশৃঙ্খলা আনয়ন করেছিল। তবু তার ভয় ছিল প্রতিমুহূর্তে কেউ কোথাও বুঝি বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। এইজন্যে সর্বদা প্রতিটি লোকের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাকে দিনযাপন করতে হয়েছে। কিন্তু একা একটি মেয়ের পক্ষে সমস্ত রাজ্যের পুরুষের ওপর চোখ রাখা যে কি দুষ্কর সে একমাত্র রিজিয়া নিজেই জানে। সর্বদা সে ভয় কণ্টকিত হয়ে থাকতো কিন্তু বাইরে দুর্বলতা প্রকাশ করতো না।

উন্মুক্ত রাজদরবারে যখন লোকটি নির্ভয়ে জলদগম্ভীর অথচ স্পষ্ট স্বরে সমস্ত সভাসদকে চমকিয়ে উচ্চারণ করলে—'আমি চাই সুলতানা রিজিয়ার পাণীগ্রহণ করতে।' তখন সেই সময় হঠাৎ মনে পড়লো ইস্কান্দারকে। রাজ্যের প্রধান সচিব ও শাসনদণ্ড বিধাতা উলুখ খাঁর কিরকম সম্পর্কে আত্মীয়। আত্মীয় বললেও ভুল হয়। উলুখ খাঁ লাহোরের একটি বাজার থেকে কয়েকটি আসরফির বিনিময়ে ইস্কান্দারকে কিনেছিল। ইস্কান্দার একরকম ক্রীতদাসই ছিল উলুখ খাঁর। ঘৃণ্য কে? ক্রীতদাস সবাই ছিল। উলুখ খাঁ, কৎলুখ খাঁ, সঙ্কেজ খাঁ, আইবক খিতাই তার রাজ্যের বড় বড় কর্মচারীরা সবাই ক্রীতদাস। কোথাকার লোক, কোথা থেকে এসেছে। কে তাদের পিতামাতা কিছুই জানার উপায় নেই। এমনিভাবে রিজিয়ার পিতা আলতামাসও এসে ছিলেন ক্রীতদাস হয়ে সুলতান কুতুবউদ্দীনের কাছে। সেদিন কুতুব তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন বলেই আজ আলতামাসের সৌভাগ্য পরিবর্তিত হয়েছে, তা না'হলে আলতামাস সেই ঘৃণ্য জীবনের মধ্যেই জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাতো।

ইস্কান্দার ক্রীতদাস বলে রিজিয়া ঘৃণা করতো না। ইস্কান্দার তাকে প্রথম প্রেম জানাতে এসেছিল। তখন আলতামাস বেঁচে ছিলেন। ইস্কান্দার গোপনে রিজিয়ার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে একদিন প্রকাশ্যে তাকে প্রেম নিবেদন করতে আসে।

আজও সে কথা রিজিয়ার মনে আছে। তখন সবে তার দেহে রূপের মাধুর্য বিকশিত হতে শুরু করেছে। দেহের কোষে কোষে শোণিতে উষ্ণতার ছোঁয়াচ লেগেছে। মনের মধ্যে অপরূপ এক সঙ্গীতের মূর্ছনা। বক্ষের সুধায় সমুদ্রের জোয়ার। কিন্তু এসব থাকলে কি হবে? রিজিয়া মনেপ্রাণে জানে, আগামী দিনে সে দিল্লীর একচ্ছত্র অধিষ্ঠাত্রী। সে সুলতানা হবে। সে যোদ্ধা হবে। সে যুদ্ধে গিয়ে বর্ম পরিধান করে অসি হাতে শত্রুর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করবে। এসব ছেলেমানুষের হৃদয় হৃদয় খেলা তার নয়। তাকে কঠিন হতে হবে। দৃঢ় হতে হবে। সংযত হতে হবে। উন্মত্ত হওয়ার জীবন তার নয়।

সেদিন সঙ্কল্প কঠিন ছিল বলে হৃদয়ের সেই চাওয়াকে কবর দিতে হয়েছিল। না হলে সেদিন ইস্কান্দারের কোমল মুখটি দেখে কি তাকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয় নি?

ইচ্ছে হয় নি পরশে পরশে রাঙিয়ে তুলতে নিজের বিকশিত অসামান্য তনু-দেহটি? ভুল। সেদিন প্রথম চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি হাহাকার করে কেঁদে উঠেছিল।

তবু যে সঙ্কল্প। অবিচলিত সে প্রতিজ্ঞা। ইস্কান্দারেব সাধ্য কি ছিল তাকে টলাবে? কিন্তু পিতা আলতামাস যখন ইস্কান্দারকে যুদ্ধে সৈনিকের বেশে পাঠালেন তখন সে না কেঁদে পারে নি। ইস্কান্দারের মৃত্যু সে চায়নি। ইস্কান্দার তার সামনে সামনে থাক্ কিংবা সে যেখানেই থাক্, বেঁচে থাক্। তার প্রথম মহব্বতের বসোরাই গোলাপটির মতো সুন্দর সতেজ জীবনটি নিয়ে বেঁচে থাক—এই চেয়েছিল রিজিয়া। কিন্তু কি কুক্ষণে যে সে বাবাকে বলেছিল। পিতা আলতামাস কন্যার মনের রূপটি ধরে ইস্কান্দারকে প্রকাশ্যে শাস্তি না দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন যুদ্ধে।

অগণিত সৈনিকের মধ্যে ইস্কান্দারের মৃতদেহ কোন্ অশ্বের পদতলে বা হস্তীর পদতলে পিষ্ট হয়েছিল রিজিয়া তা জানে না। তবে সেদিন সে খুঁজেছিল ইস্কান্দারকে—যখন যুদ্ধ থেকে অবশিষ্ট সৈনিকেরা ফিরে এসেছিল।

নিভৃতকক্ষে সুগন্ধি বর্তিকার সামনে বসে সে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ, খোদাকে জানিযেছিল সেই একটুকু একটি মেয়ে—'ইয়ে মেরে আল্লা! মেহেরবান্-খোদা। আমার গোস্তাকি মাপ করো। আমি চাই নি তাকে মেরে ফেলতে। সে আমার প্রথম প্রেমের বসোরাই গোলাপ ছিল।'

তারপর অনেক বছর চলে গেছে। অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আলতামাস মারা গেছেন। সিংহাসন নিয়ে অনেক বিদ্রোহ হয়েছে। রিজিয়ার জীবনের প্রতিটি দিন যেন এক সঙ্কল্পে অটল হয়ে উঠেছে। ষড়যন্ত্র ভেঙেছে। বিদ্রোহীদের নির্মমহস্তে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। ভায়েদের চক্রান্তকে ছিন্ন করেছে। লাহোর, লক্ষণাবলী, দেবল প্রভৃতি সুদূর রাজ্যের রাজন্যবর্গকে বশীভূত করেছে।

এক একসময় সে ভাবে, সেদিন ইস্কান্দারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে বুঝি ভালই হয়েছিল। সে বেঁচে থাকলে বোধ হয় রিজিয়া দুর্বল হয়ে পড়তো। সঙ্কল্পে টলে যেতো। হৃদয়ের পুষ্পকোরকে ইস্কান্দারের সবল পুরুষ হাতের ছোঁয়াচ অন্য এক পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটাতো। সে কাব্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, সুন্দরের উপাসক হয়ে উঠতো। ইস্কান্দারের সঙ্গে মহব্বতের গুঞ্জরণে রমণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভরিয়ে তুলতো। প্রাসাদের কোন এক নিভৃতকক্ষে আতরদান সামনে রেখে মখমলের রেশমী শয্যায় শুয়ে হীরার কণ্ঠহার গলায় দিয়ে ইস্কান্দারের ওষ্ঠে ওষ্ঠ মিলিয়ে বেহেস্তের স্বপ্ন দেখতো।

সুলতানা হওয়ার স্বপ্ন তার চিরজীবনের মতো মন থেকে মুছতে হতো। পিতা আলতামাস যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মরবার সময় সে ভবিষ্যদ্বাণী নাকচ করে দিয়ে যেতেন। উচ্ছৃঙ্খল ভাইদের হাতেই সিংহাসন দিয়ে যেতেন, নতুবা অন্য ব্যবস্থা করতেন।

না-না এই ভাল হয়েছে। ইস্কান্দার হারিয়ে গেছে পৃথিবীর জনারণ্যে। প্রয়োজন হলে তো কত ইস্কান্দার এখনই তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। আজ তার

ইস্কান্দারের অভাব ! আজ তো অঙুলি হেলনেই কত আমীর ওমরাহ, সামন্ত, শাসকরা ছুটে আসতে পারে। কেন সেনাপতি আইবক বহতু ? তার চোখের দৃষ্টিই কি বড় পরিচয় নয় ?

সেদিন যুদ্ধজয়ের পুরস্কার দিতে গেলে আইবক হঠাৎ অসাবধানে বলেই ফেলেছিল।

রিজিয়া যখন তার বিজয়ে খুশী হয়ে নিজের মহলে ডেকে পাঠিয়েছিল। রিজিয়ার পাশে ছিল তার প্রধানা বাঁদী ফিরোজা। বীর আইবক সুলতানার সামনে এসে দাঁড়ালে সুলতানার মাথা নত হয়ে গিয়েছিল। সেই দৃষ্টি। সেই চাহনি। কেঁপে উঠেছিল ভয়ে রিজিয়া। তবু তাকে জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল, আইবক কি পুরস্কার চাও ?

আইবক রিজিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। তাকানোর ভঙ্গিটি ছিল অদ্ভুত। কামনার শেষ স্তরে দাঁড়িয়ে রিজিয়ার কথার উত্তর দিয়েছিলো জড়িতস্বরে : সুলতানা গোস্তাফি মাফ করো। আমি একটিমাত্র পুরস্কার চাই।

বিস্মিত না হবার ভাণ করে তবু রিজিয়াকে জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল : কি সে পুরস্কার ? যদি দেবার মত হয় নিশ্চয় সেনাপতি আইবক তা পাবে।

এই কথায় আইবক মৃদু হেসে বলেছিল—অসম্ভব কিছু না। সুলতানা ইচ্ছে করলে আমার এই ক্ষুদ্র আরজি মঞ্জুর করতে পারেন।

রিজিয়া আর সহ্য করতে পারেনি। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ফিরোজা মৃদু মৃদু হাসছিল। তার দিকে তাকিয়ে রিজিয়া আরও ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু সংযম রক্ষা করাই তার ধর্ম। সংযম রক্ষা করে যুদ্ধজয়ী বীরকে অপমান না করে আস্তে আস্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

আইবকের পুরস্কার যে সুলতানার কৃপাপ্রার্থী, সেটুকু বুঝে রিজিয়া আইবককে কিছুতে ক্ষমা করতে পারেনি। ইতিহাস জানবে আইবক বহতু যুদ্ধে গিয়ে নিহত হয়েছিল কিন্তু আইবক বহতু যুদ্ধে নিহত হয়েছিল সত্যিকথা কিন্তু নিহত হয়েছিল রিজিয়ারই চক্রান্তে এ কথা কেউ জানবে না। নিজের পুরস্কৃত সৈন্যের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে আইবক বহতুকে নিহত করেছিল রিজিয়া। সেনাপতির পদে বসিয়েছিল মালিক কুতুবউদ্দীন হসনঘোরিকে। যে হসনঘোরি পরবর্তীকালে রণথম্বর দুর্গ ধ্বংস করে মুসলমান সেনাপতিকে উদ্ধার করেছিল।

আইবক বহতুকেও আজ ভুলে গেছে রিজিয়া। ভুলতে হয়েছে রিজিয়াকে। রিজিয়া এখন দিল্লীর সুলতানা। রাজকার্য ও রাজ্য পরিচালনা ছাড়া তার এখন আর কোন কর্তব্য নেই।

শুধু যুদ্ধ, সন্ধি, বশ্যতাস্বীকার। সমস্ত উত্তর ভারতকে তার রাজ্যের সীমাবদ্ধ করে রাজ্যবিস্তার করাই তার এখন প্রধান কাজ। পিতা আলতামাস গোয়ালিয়র বিজয় করেছিলেন। কিন্তু রিজিয়া সিংহাসনে বসবার পর আবার গোয়ালিয়রপতি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। রিজিয়া শোনা মাত্রই গোয়ালিয়র আক্রমণের জন্য সেনাদল প্রেরণ।

করে। কিন্তু দিল্লীশ্বরীর সঙ্গে পেরে ওঠা গোয়ালিয়র পতির কর্ম নয়। রিজিয়ার রণকৌশল পিতা আলতামাসের শিক্ষায়। পিতার কৌশলে রিজিয়া প্রতিটি যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। গোয়ালিয়রপতি সন্ধি করে মিন্‌হাজ সিরাজ ও মজহুল উমরা জিয়াউদ্দীন্ কুনাইদিকে সুলতানার কাছে পাঠান। রিজিয়া তাদের ব্যবহারে খুশী হয়ে মাসিরিয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও গোয়ালিয়রের কাজিপদে নিযুক্ত করেন।

আজ এই গভীর নিশীথে রজনীর তিন প্রহর প্রায় অতিক্রান্ত। বাতায়নের একপাশে একাকী নিঝুম অবস্থায় দাঁড়িয়ে অতীতের কত কথাই মনের মধ্যে জেগে উঠছে। বিস্ময়ও জাগছে। সুলতান আলতামাস যে অসমসাহসে নিজের বাহুবলে অপূর্ব কৌশলে শত্রুকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন, রিজিয়া এক দুর্বলা নারী হয়ে কি করে পিতার রাজ্যপরিচালনার নীতি অনুসরণ করে মহা মহা শত্রুকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করতে সম্ভব হলো? রিজিয়া নিজেই এই মুহূর্তে ভেবে অবাক হয়ে গেল।

এতদিন তবে কি সে কোন মন্ত্রপূত সেরাজী সরাবের নেশায় মত্ত ছিল? না'হলে এই মুহূর্তে সে চিন্তা করতে পাচ্ছে না—এতদিন ধরে কি করে সে এই রাজ্যের সমস্ত বিদ্রোহীদের আপন ক্ষমতায় নিহত করে ও বশ করে করায়ত্ত করলো? এক একজন বিদ্রোহী তাকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্যে একটি সংগঠন করে তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। বিদ্রোহের কথা মনে এলে অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক মাশিরউদ্দীন তাবাসী মুইজ্জীকে মনে পড়ে। সে বেচারী রিজিয়াকে সাহায্য করতে গিয়েই বেঘোরে প্রাণটা দিলো। তবে মুইজ্জী যে একেবারে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল তা নয়। মনে মনে রিজিয়াকে সে ভালবাসতো। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে দিল্লীশ্বরীর পাশে দাঁড়াবার স্বপ্নও তার ছিল। সেকথা যাক্। অনেকেই রিজিয়ার রূপলাবণ্যতে মোহিত হয়ে তাকে কামনা করতো কিন্তু মুইজ্জীর মতো কেউ এগিয়ে এসে প্রাণটা দিতে সাহস করেনি। সেইজন্য রিজিয়া আজীবন মুইজ্জীর কাছে কৃতজ্ঞ।

সেদিন রিজিয়ার জীবনের দারুণ সঙ্কটময় অবস্থা। ভাই রুকনউদ্দীনকে অপূর্ব কৌশলে নিহত করে তার মা শাহতুর্কানকে বন্দী করে সবে সে সিংহাসন অধিকার করেছে। রুককে মসজিদ প্রাঙ্গণে চালাকির ছলে নিহত করে তার মনে একটা অনুশোচনা এসেছিল। আগা হাজার হোক সে তো তার বৈমাত্রেয় ভাই! না হয় সিংহাসনের জন্য দুজনে দুজনের শত্রু। কিন্তু একই পিতৃশোণিত তাদের দুজনের শরীরে প্রবাহিত। একই মায়ের গর্ভে তাদের দুজনের জন্ম নয় বটে তবু তো তাদের পিতা এক।

কিন্তু তবু রুককে রিজিয়া ক্ষমা করতে পারেনি। ক্ষমা করতে পারেনি এইজন্যে যে রুক তার মায়ের প্ররোচনায় একটি ভীষণ অপরাধ করেছিল। যে অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। বৈমাত্রেয় ভাই মুইজুকে হত্যা করেছিল। বেচারী পনেরো বছরের একটি সরল কিশোর। ঠাণ্ডা, মিষ্টি ফুলের মত প্রাণচঞ্চল। এক ঝলক আলোর মতো সে প্রাসাদের চারিদিক আলো করে ঘুরে বেড়াতো। এই বৈমাত্র-

ভাইটিকে রিজিয়া বড় স্নেহ করতো। মুইজুর কমনীয় মুখখানি তার সবচেয়ে আদরের ছিল। এই মুইজুকে রুক হত্যা করলো। হত্যা করলো কিসের জন্য?

মুইজু দুদিন বাদে বড় হয়ে উঠে রাজ্য অধিকার করতে পারে। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে যত তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। সেইজন্যে রুক সরিয়ে দিলো। কিন্তু খবর শুনে রিজিয়া দারুণ মর্মাহত হলো। মুইজুকে যে রুক পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারে—রিজিয়া স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। অমন কমনীয় সুন্দর মুখখানি চিরতরে ম্লান হয়ে গেল ভাবতে গিয়ে রিজিয়া মনে মনে দারুণ শোকার্ত হয়ে উঠলো। রুকের নিষ্ঠুরতা সে কিছুতে ক্ষমা করতে পারলো না।

রুক নিজেও পরে তার ভুলটা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মুসলমান সুলতানরা সিংহাসনের জন্য নিজের পিতাকেও হত্যা করতে দ্বিধা করে না জানে বলেই সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল যে রিজিয়া অন্যায় যাই বলুক আসলে সে কোন অন্যায় করেনি। কিন্তু রিজিয়া প্রতিবাদ করতে তার ওপর অত্যাচার শুরু করলো রুক ও তার মা শাহতুর্কান।

রিজিয়া কিন্তু নীরবে রুকের অত্যাচার সহ্য করলো না। সুযোগের অপেক্ষায় থাকলো রুককে জব্দ করার। কিন্তু রুক চেয়েছিল রিজিয়াকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। কারণ পিতা আলতামাস সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করে গেছেন রিজিয়াকে। আলতামাসের মৃত্যুর পর কিছু আমীর-ওমরাহ, রাজন্যবর্গরা নারীর বশ্যতা স্বীকার করতে চাইলো না, সেইজন্য রুকনউদ্দীনকে তারা সিংহাসনে বসালো। কিন্তু রুকনউদ্দীন মনে মনে রিজিয়াকে এড়িয়ে চলতো। রিজিয়া পুরুষের মতো অসি খেলায়, ধনুঃশর ক্ষেপণে, বর্শা নিক্ষেপে ওস্তাদ ছিল রুক তা জানতো। পিতা নিজের হাতে রিজিয়াকে এসব বিদ্যা শিখিয়ে গেছেন।

কিন্তু রুক কিছু ষড়যন্ত্র করার আগেই রিজিয়া একদিন হঠাৎ কৌশল অবলম্বন করলো। প্রাসাদের অলিন্দ থেকে করুণ মর্মভেদী কণ্ঠে আত্মবেদনা নিবেদন করতে লাগলো। প্রাসাদের পাশেই রাজপুঙ্গবদের নামাজ পড়ার মসজিদ। সেদিন শুক্রবার। রুক নামাজ পড়বার জন্যে আল্লাকে আরাধনা করবার জন্যে প্রবেশ করছে মসজিদে। এই সময় রিজিয়ার আত্মবেদনাও তার কর্ণগোচর হলো। সে রিজিয়ার ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু সর্বকালে সর্বদেশে নারীর আরজিই সর্বপ্রথমে বিবেচিত হয়। রিজিয়া রুকের সম্বন্ধে অকথ্যভাবে রাজপুঙ্গবদের শুনিয়ে শুনিয়ে তার লাঞ্ছনার ব্যাখ্যা কর্ণগোচর করতে লাগলো। একজন অবলা নারীর ওপর এমনি অত্যাচার, রাজপুঙ্গবরা দারুণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ক্ষিপ্ত হয়ে তারা রুকনউদ্দীনকে আক্রমণ করলো। সে সময়ে রিজিয়ার অভিনয়টি হয়েছিল সুন্দর। এমনভাবে মর্মবেদনা জানিয়ে সবার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল যে রুককে কেউ কিছু বলতে দেয় নি। রাজপুঙ্গবরা নামাজের কথা ভুলে গিয়ে অত্যাচারী রুকনউদ্দীনকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে রিজিয়ার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল। সেদিন মসজিদ প্রাঙ্গণ দিল্লীর সম্রাট রুকনউদ্দীনের রক্তে স্নান শেষ করেছিল।

ভায়ের জন্য মনে তীব্র অনুশোচনা জাগে। একই শোণিতে প্রবাহিত ভাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়ে রিজিয়া বেশ কিছুকাল সহজভাবে চলাফেরা করতে ভুলেছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে মুইজুর কথা মনে এলে সে আত্মচেতনা ফিরে পেয়েছে। শান্তি পেয়েছে।

তা ছাড়া রুককে হত্যা না করলে যে সিংহাসন লাভের আশা দুরাশা ছিল সে কথা ভেবেই রিজিয়া রুককে নিহত করতে বাধ্য হয়েছিল। নাশিরউদ্দীন তখন নাবালক। রাজন্যবর্গেরা আর উপায় না দেখে উপযুক্ত সুলতানা হিসাবে দিল্লীর সিংহাসনে রিজিয়াকেই বসাতে বাধ্য হলো। রিজিয়া মনে মনে শুধু হাসলো। আর অন্য ভাইরা তারা উচ্ছৃঙ্খল ছিল বলে তাদের সিংহাসন দেওয়ার কথা চিন্তাও হলো না।

কিন্তু রিজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করবার পর একদল রিজিয়ার স্বপক্ষে থাকলো, আর বেশীর ভাগ রিজিয়ার বিপক্ষে দাঁড়ালো। তার মধ্যে উজীরপ্রধান নিজাম উলমুলক জুনাইদি একজন। তিনি মালিক জানি, মালিক কোটি, মালিক কবীর খাঁ ও মালিক ইজ্জুদ্দীন মহম্মদ সালারীর সহযোগে সুলতানা রিজিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়ে দিল্লীনগরের প্রাচীরদ্বার আক্রমণ করলেন।

রিজিয়ার রণকৌশল আগেই শেখা ছিল। একদল সুদক্ষ যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে সাহসে নিজেই প্রাচীরদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হল। ঘোরতর যুদ্ধ বাধলো। এই সময়ে অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক মাশির উদ্দীন্ তাবাসী মুইজ্জী স্বীয় বাহিনী নিয়ে দিল্লীশ্বরীর সাহায্যার্থে নগরাভিমুখে প্রবেশ করলো।

রিজিয়া যুদ্ধ করতে করতে লাহোর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। লাহোরের শাসনকর্ত্তাও বিদ্রোহী হয়ে শাসনযন্ত্র বিকল করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। রিজিয়া তাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করে লাহোরে আবার সুশাসন ফিরিয়ে নিয়ে এলো। সেই সময় তার কর্ণগোচর হলো যে মুইজ্জী নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে সাহায্য করার জন্যে দিল্লীনগরাভিমুখে এগিয়ে গেছে। শোনা মাত্রই রিজিয়া তার দ্রুত অশ্বারোহী বাহিনী সঙ্গে নিয়ে দিল্লী-নগরাভিমুখে এগিয়ে চললো। মুইজ্জীর জন্য তার মনে কাতরতার সৃষ্টি হলো। রিজিয়াকে যারাই যখন সাহায্য করতে এসেছে তাদের জন্য দিল্লীশ্বরীর রমণী মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। নিজের জন্য কখনও সে কোনদিন চিন্তা করেনি কিন্তু সাহায্যকারীর জন্য তার প্রাণ পর্যন্ত অনেক সময় সমর্পণ করেছে।

সেইজন্যে মুইজ্জীর দুর্ভাগ্য উপস্থিত হওয়ার আগেই যাতে তার সঙ্গে মিলিত হতে পারে সেই ভেবে সে দ্রুত যমুনা নদীর পার দিয়ে এগিয়ে চললো। তার ও তার বাহিনীর দ্রুত অশ্বের পায়ের শব্দ সেদিন যমুনা নদীর জলেও ঢেউ সৃষ্টি করেছিল। যমুনা নদীর পারে ধুলোর আকাশ সৃষ্টি করে রিজিয়া তার বাহিনী নিয়ে দিল্লীর নগরের দিকে এগিয়ে চললো।

কিন্তু বিদ্রোহীরা রিজিয়ার রণকৌশল লাহোরেই প্রত্যক্ষ করেছিল। সামান্য নারী বলে যাকে তারা উপেক্ষা করেছিল, সে যে সামান্য নয় তার প্রমাণ প্রতি পদে

পদে তারা পাচ্ছিল। তাই যখন তারা শুনলো রিজিয়া তার বাহিনী নিয়ে অযোধ্যাপতির সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ছুটে আসছে, তখন আর বিলম্ব না করে উজীরের পক্ষীয় বিরোধী সেনাপতিগণ মুইজ্জীকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করলো।

রিজিয়া যখন দিল্লীনগরের কাছাকাছি এসে পৌছলো, পৌছে মুইজ্জীর নিহত হবার সংবাদ শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ক্ষিপ্ত হয়ে নগর পরিত্যাগপূর্বক বাইরে এসে যমুনার তীরে শিবির সন্নিবেশিত করলো। এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো— মুইজ্জীকে যারা নিহত করেছে তাদের সে কখনও ক্ষমা করবে না। মুইজ্জী-হত্যার প্রতিশোধ নেবে সবার আগেই।

যমুনাতীরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তার দারুণ যুদ্ধ শুরু হলো। সৈনিকের রক্তে যমুনা নদীর জল লোহিতবর্ণ ধারণ করলো। সৈনিকের মৃত্যুযন্ত্রণার কাতর চীৎকারে যমুনা তীর মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। চীৎকার, কোলাহল, অসি ঝনঝনানিতে রণক্ষেত্র যেন একটা দারুণ ধ্বংসের মুহূত নিয়ে চীৎকার করতে লাগলো। এদিকে রিজিয়া মৃতপ্রায় সৈনিকের যত আর্তনাদ শোনে তত তার দেহে যুদ্ধের মাতন স্ষ্টি হয়। সে যে রমণী, রমণীর ধর্ম কোমলতা, রমণীর কর্ম সুস্থ, রিজিয়াকে দেখে যেন সেই মুহূর্তে মনেই হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে বড় বড় যোদ্ধারা অবাক হয়ে রিজিয়ার রণকৌশল দেখে মনে মনে ভীত হয়ে উঠলো। যারা আলতামাসের রণকৌশল জানতো তারা মনে মনে আলতামাসকে সেলাম জানালো। বিদ্রোহীরা আস্তে আস্তে রিজিয়ার ক্ষমতায় চমকিত হয়ে রণে ভঙ্গ দেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

অবশেষে বিদ্রোহী দলপতি মালিক মহম্মদ সালারী ও মালিক কবীর খাঁ আবার সুলতানার পক্ষে এসে যোগদান করলো। রিজিয়া মনে মনে তার জয় হয়ে গেল জেনে খুশী হয়ে উঠলো। সালারী ও কবীর খাঁ দলে এসে যোগদান করতে সে কিছু বললো না—কারণ সে রাজ্য চালাবে। সিংহাসনের পাশে উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকলে তার পক্ষে রাজ্য চালনা করা সম্ভব নয়। তাই কবীর খাঁ ও সালারীর বীরত্বকে স্বীকার করে তাদের দলে যোগ করে নিলো। কিন্তু সে মুইজ্জীর হত্যাকারীদের ক্ষমা করতে পারলো না। সুলতানার নির্দেশে একদল অশ্বারোহী—সেনানায়ক মালিক কোটী ও তার ভাই ফখরউদ্দীনের পিছনে ছুটলো। রিজিয়ার নির্দেশ ছিল এদের নিহত করার। তাই একসঙ্গে মালিক জানি, কোটি ও ফখরউদ্দীনকে পেয়ে সৈনিকরা তাদের নিহত করলো। দলের গুরু উজীর নিজাম-উলমুলক জুনাইদিকে আর ধরতে পারা গেল না। সিরমুর প্রদেশে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

রাজ্য থেকে শত্রু বিতাড়নের পর রিজিয়া নিশ্চিত হয়ে সিংহাসনে বসে উজীরপ্রবরের সহকারী খাজা মহজুবকে নিজাম-উলমুলক উপাধি দিয়ে মন্ত্রীপদ দান করলো। মালিক সৈফউদ্দীন আইবক্ বহতুকে কৎলুখ খাঁ উপাধি দান করে তাকে সেনাপতি পদে বসালো। এই আইবক বহতুর কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। বহতুর অন্ত ইচ্ছার শাস্তি রিজিয়া বেশ ভালভাবেই তাকে দিয়েছে। কবীর খাঁকে লাহোর প্রদেশের শাসনকর্তা করে রিজিয়া রাজ্যে সুশৃঙ্খলা আনয়ন করলো।



এ সব অতীত কাহিনী আজ যেন তার চোখের সামনে সব ছবির মত ফুটে উঠছে। আজ যেন মনে হচ্ছে সে সিংহাসন পাওয়ার পরে যে সব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে, যাদের সে নিজের শক্তির কৌশলে পরাজিত করেছে সে সব কৌশল অবলম্বন করা তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। অন্য কোন রিজিয়া নামে শক্তিময়ী দিল্লীর সিংহাসন শত্রুমুক্ত করেছে। এই মুহূর্তে সে ভাবতে পারে সে এক অবলা রমণী। রমণীহৃদয় নিয়ে সে দয়িতের জন্য নিশিদিন প্রহর রচনা করে চলেছে।

সেদিনের প্রভাতের ঘটনাটিই সর্বদা তার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুসজ্জিত দরবারগৃহ। দিল্লীর অসামান্য দরবার। সুসজ্জিত ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। দরবার গৃহের সম্মুখ দিয়ে একটি মর্মরময় সোপান বরাবর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সোপানশ্রেণী শেষ হলে একটি রাজোচিত সজ্জাপূর্ণ মর্মরময় দালান। দালানটির খিলানের নীচে—রঞ্জিতস্ফটিকপাত্রে সদ্যচয়িত সুবাসপূর্ণ, সরস পুষ্পসমূহ সুরক্ষিত। গন্ধরাজ, বেলা, মল্লিকা, চম্পা, চামেলি প্রভৃতি সুগন্ধভরা কুসুমাবাসে দালানের বারান্দাটি মনোমদ সুগন্ধে আকুলিত। বারান্দার মধ্যস্থলেই একটি রৌপ্যময় বেষ্টনীর মধ্যে, শ্বেত মর্মরময় আধারের ওপর রজতনির্মিত গোলাপের ক্ষুদ্রপ্রস্রবণ। তা থেকে অনবরত গোলাপজল উৎসারিত হয়ে সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমাবাসের সঙ্গে মিশে সে স্থানকে বেহস্তের সুগন্ধে পূর্ণ করেছে।

প্রতিটি দ্বারে রক্ত রাগবর্ণের ঝালর পরদা কোণাকুণি ভাবে ঝুলিয়ে দ্বারের শোভা বাড়ানো হয়েছে। দ্বারের দু'দিকে বিশালাকায় সশস্ত্র প্রহরী। দরবার গৃহের মধ্যে ঐশ্বর্যপূর্ণ উচ্চ সিংহাসনে বসে রিজিয়া। তার পরণে আজ পুরুষের বেশ নয়। রূপসী রমণী সাজেই সে দরবার গৃহের সিংহাসনে বসেছে। স্বর্ণখচিত মণিদ্যুতি পূর্ণ সিংহাসন। স্বর্ণখচিত মণিদ্যুতি পূর্ণ সিংহাসনে বসে তাকে আরও অপরূপ দেখাচ্ছে। রত্নখচিত ফিরোজা-রঙের ওড়না ভেদ করে রূপসী রিজিয়ার সৌন্দর্যপূর্ণ মুখমণ্ডল যেন স্বর্গের অপ্সরার মতো হয়ে উঠেছে। পাশে দণ্ডায়মান প্রিয় সহচরী ফিরোজা। তাকে যুদ্ধে যাওয়া ছাড়া প্রায় সব সময়ই রিজিয়া কাছে রাখে। ফিরোজা ছাড়া অন্য আরও দুজন খোজা প্রহরী তার সঙ্গে সর্বদা ছায়ার মত ঘোরে।

সিংহাসনোপবিষ্টা সুন্দরী সুলতানা রিজিয়া একের পর এক বিচার মন্ত্রীর সহযোগে সম্পন্ন করে চলেছে। এক একটি বিচারের অদ্ভুত চরম শাস্তি এক এক সময়ে আমীর-ওমরাহদের মধ্যে গুঞ্জনের সৃষ্টি করেছে। রিজিয়ার মুখে কিন্তু সেই মৃদু হাসি।

সে যে এতো কঠোর ভাবে বিচারকের ভূমিকা নিয়ে অভিনয় করে চলেছে তা তার মুখের কোথাও এতটুকু রেখাঙ্কিত হয়ে উঠছে না। সে মুখ সহজ, সুন্দর হাস্যময়। অবগুণ্ঠনের আড়ালে তার এই রাজ্য পরিচালনা সমস্ত আমীর-ওমরাহ, রাজন্যবর্গের শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এই সময় হঠাৎ দরবার গৃহের মধ্যে প্রহরীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে এক সুবিশাল দীর্ঘ সৈনিক পুরুষ এসে প্রবেশ করল। সমস্ত দরবার গৃহ তার আগমনে স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই দীর্ঘ সৈনিক পুরুষ মুসাফেরকে রিজিয়ার সামনে এনে দাঁড় করালে মন্ত্রী নিজাম-উলমূলক ক্ষুব্ধ ও বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? কি চাও? তোমাকে ধরে আনা হয়েছে কেন?

মুসাফেরের উত্তর দেবার পূর্বেই প্রহরীদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল—এই বিদেশী গোপনে প্রাসাদে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল বলেই তাকে আমরা ধরে নিয়ে এসেছি।

কিন্তু মুসাফের তাচ্ছিল্য ভাবে হেসে বলল, আমাকে ধরে নিয়ে আসবার সাহস এই দুর্বল প্রহরীদের কর্ম নয়। আমি নিজেই ধরা দিয়েছি। ধরা দিয়েছি এই জন্যে যে—সহজে সুলতানার কাছে পৌছতে পারবো বলে।

মন্ত্রী আবার জিজ্ঞাসা করল—কি তোমার প্রয়োজন এখানে বলতে পারো। যদি অশোভনজনক কিছু না হয় তাহলে তোমার এই অনধিকার প্রবেশের শাস্তি লঘু হবে।

মুসাফের আবার তাচ্ছিল্যভাবে হেসে বলল—হাবসী প্রাণের মায়া করে না। যদি সুলতানা আমার কথা শোনেন ও তার উত্তর দেন তাহলে এ বান্দা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

দরবার গৃহের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিদেশী মুসাফেরের এই বেয়াদপী সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা গুঞ্জন করে কেউ কেউ প্রতিবাদ করে বিদেশীর এই বেয়াদপীর শাস্তি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু রিজিয়া রাজন্যবর্গের প্রতিবাদে কোন কর্ণপাত করলো না। তার স্বভাবটি সব সময়ে সংযত। কিন্তু সে বিস্মিত হল, বিদেশী মুসাফেরের সাহস দেখে। লোকটির দিকে বারকয়েক তাকিয়ে সে মনে মনে বিদেশীর স্বাস্থ্যের প্রশংসা করলো। কি সুন্দর বিরাট পুরুষ। কি সুন্দর দীর্ঘ দেহ, চওড়া বক্ষ। তার অগণিত সৈনিক ও রাজন্যবর্গের মধ্যে একটিও নেই। তার ওপর এই দেহের সঙ্গে মিলেছে দুর্জ্জয় সাহস। যেন রাজযোটক।

সাহস না থাকলে এমনি উন্মুক্ত রাজ দরবারে অগণিত বীরপুরুষদের মাঝখানে এমনি সাহসে সে সুলতানার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়? মনে মনে রিজিয়া এই বিদেশী মুসাফেরকে সাধুবাদ জানালো। তারপর মন্ত্রীকে কাছে ডেকে বলল—ওকে বলো, আমি তার কথা শুনছি, সে যা বলতে চায় আমাকে বলুক। কিন্তু মন্ত্রী সে কথা বলতে বিদেশী মুসাফের ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, সুলতানা যদি নিজে কথা বলেন ও শোনেন তাহলে আমার আরজি পেশ করতে পারি।

রিজিয়ার মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়ে উঠলো। নিজেকে সামলাতেও তার কয়েক মিনিট সময় লাগলো। তারপর একটু প্রকৃতস্থ হলে সহজ ও স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞেস করলো—মুসাফের কি চাও তুমি ?

মুসাফের মৃদু হেসে কুর্নিশ করে বলল—সেলাম আলেকুম্ সুলতানা।

রিজিয়া মৃদু হেসে মাথাটা একটু হেলিয়ে সায় দিয়ে বলল—তোমার নাম কি নওজোয়ান, তুমি কি চাও ? বিনা হুকুমে এখানে প্রবেশ করেছ কেন ?

মুসাফের এতটুকু ভীত না হয়ে স্পষ্টস্বরে বলল—আমার নাম জালাউদ্দীন ইযাকুত। আমি চাই সুলতানার পাণিগ্রহণ করতে। যদি আমার আরজি মঞ্জুর হয় তাহলে আমি সুলতানার কাছে খোদার নামে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

কিন্তু তার কথা সম্পূর্ণ হোলো না। সভাসদ গর্জে উঠলো। আমীর, ওমরাহ, মন্ত্রী, সেনাপতি বিশিষ্ট রাজন্যবর্গরা উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধস্বরে বলল—এই মুহূর্তে এই বেতমিজের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হোক। লোকটা নিশ্চয় উন্মাদ। না'হলে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এই দরবার গৃহে এসে প্রকাশ্যে এতগুলি বিশিষ্ট রাজন্যবর্গের সামনে দিল্লীর সুলতানাকে এমনি অসম্মান করতে সাহস পায় ?

তারপর সকলেই আস্ফালন করে একসময় চুপ হয়ে গেলো। প্রত্যেকেই বিস্ময়ে তাকালো সুলতানা রিজিয়ার দিকে। কিন্তু সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেলো রিজিয়ার মুখচ্ছবি দেখে। সে মুখে তখনও মৃদু হাসি। এতটুকু রাগের চিহ্ন কোথাও ফুটে ওঠেনি। শুধু চোখের কালো মণি দুটোয় একটু লজ্জার ভাব। মনে হলো যেন রিজিয়ার গণ্ডেও রক্তিমার চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

রিজিয়া তখনও আশ্চর্য মুগ্ধ হয়ে ভাবছিল লোকটির সাহসের কথা। যে কথা স্পষ্ট করে কখনও কোন রাজন্যবর্গ উচ্চারণ করতে পারেনি সেকথা এই অপরিচিত মুসাফের কি করে উচ্চারণ করলো ? শুধু বীর নয় লোকটি, অদ্ভুত ক্ষমতা সমস্ত দিল্লী সাম্রাজ্যের একটি নিদর্শনস্বরূপ। রিজিয়া নিজে বীরাঙ্গনা। বীর পূজারী। বীরকে সহজে শাস্তি দিতে সে সব সময় একটু ভাবে।

তাই যখন এই ঔদ্ধত্যের জন্য সমস্ত রাজন্যবর্গ তার বিচারের অপেক্ষা করছে তখন রিজিয়া কোন চিন্তা না করে মন্ত্রীকে আদেশ দিলো—আজ এই মুসাফেরকে কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হোক। আগামীকল্য এর বিচার হবে।

রাজন্যবর্গরা ভাবলো হয়ত উপযুক্ত শাস্তির বিষয় চিন্তা করার জন্য সুলতানা রিজিয়া একদিনের সময় নিলো। কিন্তু তারা যদি জানতো, রিজিয়া এই মুসাফের বিদেশীর প্রেমে পড়েছে ! দিওয়ানা হয়ে গেছে !

হ্যাঁ, রিজিয়া এই বিদেশী মুসাফেরের প্রেমেই পড়েছে। তা না'হলে এই গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে একা এই প্রাসাদে নিজের আরাম ঘরে না শুয়ে অলিন্দের কাছে দাঁড়িয়ে ভাববে কেন ? তার চোখে ঘুম নেই কেন ? তার বুকের মধ্যে কিসের আলোড়ন শুরু হয়েছে ? কি যেন হারাবার ভয়ে সে ভীত হয়ে উঠেছে এই নিশীথ রাতে।

কাল তার পরীক্ষা শুরু হবে? আগামীকল্য স্থলতানা রিজিয়ার আসল পরিচয় সমস্ত রাজ্যের লোক জানতে পারবে? স্থলতান আলতামাসের উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের মতো তাঁর কন্যাও রাজকর্তব্য বিস্মৃত হয়ে তার ভাইদের পথানুসরণ করেছে। যারা এখনও গোপনে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে তারা এই স্থযোগে রিজিয়ার দুর্বলতা দেখে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এতো কষ্টের রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল, সে শান্তি আগামীকল্য থেকে আর থাকবে না। রাজ্যে ঘোষণা ছিল, বিয়ে-শাদী কেউ করতে গেলে রাজাজ্ঞা নিতে হবে, নতুবা কারাবাস। আগামীকল্য থেকে সে রাজাজ্ঞার ভিত দুর্বল হয়ে যাবে। শিথিল হয়ে যাবে সমস্ত রাজ্যের নিয়মকানুন। যে যা খুশী ইচ্ছে করবে তাই সে করবে।

আগামী প্রভাতের পর থেকে সমস্ত রাজ্যের চারিদিকে শান্তির পরিবর্তে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হবে। আমীর-ওমরাহ, রাজন্যবর্গ যারা তার বশ্যতা স্বীকার করে রাজ্যশাসনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তারা আবার বিদ্রোহী হবার চেষ্টা করবে। নারীসম্ভ্রমকে বাঁচানোর জন্য রাজাজ্ঞা দিয়ে রাজ্যে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলতা কমাবার চেষ্টা করেছিল আবার তা জেগে উঠবে। সেরাজী সরাবের নেশায় মাতাল হয়ে আবার রমণী ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে।

এসব কথা চিন্তা করে দিল্লীশ্বরীর মানসিক অবস্থা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু ঐ জালাউদ্দীন ইয়াকুতই যে তার সমস্ত কর্তব্য চূর্ণ করতে আজ রাজদরবারে এসে তাকে সব ভুলিয়ে দিলো। ভুলিয়ে দিলো তার সমস্ত রাজকার্য। বিচার ক্ষমতা। বীরাঙ্গনা শক্তি। তার যে এখনও হৃদয় আছে। এখনও মন বলে একটি পদার্থ সযত্নে আড়াল করে রাখা আছে। রমণী-হৃদয়ে কুসুম ফুটে আছে। জালাউদ্দীনকে দেখবার আগে একবারও তার মনে হয়নি সে কখনও কোন পুরুষকে আকাঙ্ক্ষা করতে পারে! বীরকে শুধু পূজা নয়, আপন করার জন্যে সমস্ত রাত্রি জেগে ভাবতে পারে!

তবে কি সেই মৃত ইস্কান্দারের আত্মা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই জালাউদ্দীন ইয়াকুত নামের ছদ্মবেশে তাকে এসে মুগ্ধ করলো? সেই ইস্কান্দার! রিজিয়ার যৌবনের প্রথম পুরুষ। প্রথম পুরুষের ভালবাসার পরশ। রিজিয়াকে একদিন ইস্কান্দার প্রাসাদের নিরালা সোপানে আপন করে নেওয়ার জন্যে জড়িয়ে ধরেছিল। জড়িয়ে ধরে রিজিয়ার গোলাপী কম্পমান কোমল ওষ্ঠে এঁকে দিয়েছিল মহব্বতের চিহ্ন। রিজিয়া আবেশ মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছিল নিজের চেতনা। মুহূর্তে তারও হৃদয়ের শোণিতে আগুন জ্বলে উঠেছিল। ঝিম্ লেগে গিয়েছিল সমস্ত শরীরের উর্ধাঙ্গে। বুকের কুসুমাস্তীর্ণ সমুদ্রের উত্তালতায় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। চোখে নেমে এসেছিল লজ্জার রং।

কিন্তু হঠাৎ চমক ভেঙ্গে গেল রিজিয়ার। ইস্কান্দারের মুখে সেরাজী সরাবের গন্ধ। নেশা কেটে গিয়ে তার ক্রুদ্ধভাব জেগে উঠলো। সে নিজের হাতে ইস্কান্দারের গালে ঠাস্ করে চড় কষিয়ে দিলো। বললো জাহান্নমে যাও। সেরাজী পান করে কখনও আমার সঙ্গে কথা বলতে এসো না বেতামজ।

সেদিন ইস্কান্দার গালে হাত বুলোতে বুলোতে চলে গিয়েছিল। আর রিজিয়া ইস্কান্দারের ওষ্ঠের ছোঁয়াচ নিজের ওষ্ঠে অনুভব করেছিল। সেরাজী সরাবের দুর্গন্ধ সেখানে নেই। কি যেন এক সুগন্ধ মাদকতা। সম্ভবত বসোরাই গোলাপের সুগন্ধের চেয়েও মনোরম। সেই গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে বিভোর হয়েছিল অনেকক্ষণ। অনেক স্বপ্ন, অনেক কল্পনা। প্রথম প্রেমের সেই অনাস্বাদিত আনন্দ। কি মনোরম লাগছিল সেই সময়।

আজও যেন ইয়াকুতকে দেখবার পর সেইরকম কোন এক মনোরম পরিবেশের স্বপ্ন মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। ইয়াকুত যদি সেই মুহূর্তে সিংহাসনের ওপর উঠে তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরে ওষ্ঠে ওষ্ঠ মিলিয়ে দিত, তাহলে কি সে বাধা দিতে পারতো? মন্ত্রী, সেনাপতি, আমীর-ওমরাহ, রাজন্যবর্গরা আশা করে আছে, আগামীকল্য এই মুসাফেরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হবে। সুলতানা রিজিয়ার সম্ভ্রম নষ্ট করার অপরাধে—প্রাণদণ্ড!

কিন্তু যখন আগামীকল্য দরবারে বসে রিজিয়া সে ধরণের কোন শাস্তির হুকুম দেবে না, তখন সমস্ত রাজ দরবারের বিশিষ্ট অতিথিরা কি মনে করবে? লোকটিকে কি করা যায়? মহাসংস্থার মধ্যে দিয়ে সুলতানার নির্ঘুম রজনী অতিবাহিত হতে লাগলো।

খুসক্ ফিরোজী প্রাসাদের চারিদিকে রাতের নিস্তব্ধতা। প্রাসাদের তোরণদ্বারের দ্বাররক্ষীর পায়ের শব্দ মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করছে। এত বড় প্রাসাদের আর কোথাও কেউ জেগে নেই। রিজিয়ার পাশের ঘরে বাঁদী ফিরোজা ঘুমিয়ে আছে। তার পাশের ঘরে অন্যান্য বাঁদীরা। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ফিরোজা তার কাছে ছিল। সুলতানার চোখে ঘুম আসছে না কেন তার জন্য তার চিন্তার শেষ ছিল না। সুগন্ধি গোলাপ জল স্বর্ণপাত্রে এনে অনেকবার রিজিয়াকে পান করিয়ে ঘুমের জন্য অনেক মেহনত করেছে। শরীরের মধ্যে কি যাতনা হচ্ছে—ফিরোজা অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে—কিসি লিয়ে এত্না তক্‌লিফ সুলতানা! মৃদু হেসে ফিরোজাকে উদ্বেগ প্রকাশ করতে নিষেধ করেছে রিজিয়া। রিজিয়া জানে, ফিরোজা বুঝতে পাচ্ছে সুলতানার তক্‌লিফ কি? সেও রমণী। তারও হৃদয় আছে। দরবার ঘরে সেও সকালে উপস্থিত ছিল। সেও দেখেছে বিদেশী মুসাফেরকে। মুসাফেরের নির্লজ্জ কথাগুলি সেও শুনেছে। তখনকার মুখের অবস্থা-রিজিয়ার কিরকম হয়েছিল ফিরোজা তাও দেখেছে। কিন্তু কোন উত্তর দেয়নি। সুলতানার কাজের কোন কৈফিয়ৎ বা

জিজ্ঞাসা বাঁদীর শোভা পায় না। যদিও সুলতানা ফিরোজার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করে না। সুলতানা সব কথাই ফিরোজাকে বলতো। কিন্তু সুলতানা বলতো। ফিরোজা কখনও জিজ্ঞাসা করে নি। হয়ত তার ভয় করতো। হয়ত ভাবে, যদি অপরাধ হয়ে যায়? যদি বেওকুফের মত কোন অতিরিক্ত দাবী পেশ হয়ে যায়? সুলতানার মেজাজের হদিশ সব সময় পাওয়া বড় মুস্কিল।

মনে মনে হাসে রিজিয়া। সবাই তাকে ভয় করে। শুধু মানুষ নয় বনের পশু, পক্ষী পর্যন্ত। সে দিল্লীর প্রথম নারী সুলতানা। নারীর কোমল হাতের পরিচালনায় রাজ্যের বড় বড় যোদ্ধা আজ ভীত। রিজিয়া ইতিহাস তৈরী করছে। পৃথিবীতে প্রথম নারী সুলতানা হিসাবে তার নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু আজ একি তার হলো? কিছুতে যে মানসিক চাঞ্চল্য স্তিমিত হচ্ছে না? আর কতক্ষণ যে এমনি বাতায়নের অলিন্দে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে চাঁদের আলোর রূপ দর্শন করবে? একটু বিশ্রাম কি খোদা তাকে দেবে না? সারাদিন ধরে রমণী হযে যে পরিশ্রম তাকে করতে হয় তারপর যদি এই রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি দেহে নেমে আসে তাহলে পরদিন প্রভাত থেকে আবার সে কেমন করে রাজকার্য পরিচালনা করবে?

নিজের শয়ন ঘরে ফিরে এল রিজিয়া। উজ্জ্বল বর্ত্তিকার আলোয় সুলতানার শয়ন ঘরটি ঝলমল করে উঠলো। স্বর্ণ পালঙ্কের ওপর মখমলের শুভ্র শয্যা। ঘরের মধ্যে সুগন্ধির বাস। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে বহু মূল্যের সুদৃশ্য দর্পণ। দর্পণে রিজিয়ার অপরূপ গোলাপী দেহের ছায়া পডলো। দর্পণের দিকে তাকিয়ে রিজিয়া নিজের সুন্দর দন্তপংক্তি দিয়ে গোলাপী অধর চেপে ধরলো।

চীৎকার করে তার বলতে ইচ্ছে করল—কেন কেন কি জন্যে এই রূপ এই দেহে দিলে খোদা! আমি যে সুলতানা। আমি যে দেওয়ানা। আমার হৃদয়কে গোপন করে আমাকে কর্তব্য করতে হবে। দেওয়ানার মতো সব নিঃস্ব হয়ে আমাকে আমার রাজ্যকে সুশৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে হবে। আমার ভালবাসার অধিকার নেই। মহব্বতের মিঠে আতরের সুগন্ধি মেখে চোখে সুরমা দিয়ে প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্ন হবার জন্যে আমার জন্ম নয়।

রিজিয়া ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো শয্যার ওপর। সুন্দর দুটি আয়ত চোখের কোলে রাত্রি জাগরণের কালিমা। মণি-খচিত সাচ্চা কাজ করা নীলাভ ওড়নাটা অবহেলাভরে বুকের কুসমাস্তীর্ণ থেকে মেঝেতে পড়ে লুটচ্ছে। চোখের কোণ দুটোয় দু'টুকরো মুক্তার বিন্দু হীরের মত জলজল্ করে উঠলো। বড় তৃষ্ণার উদয় হতে রিজিয়া তাকালো ঘরের চারিদিকে। স্বর্ণপাত্রে জল ঢাকা আছে একপাশে দেখতে পেল। কিন্তু অন্য জায়গায় স্বর্ণভৃঙ্গারে সেরাজী সরাব। বিস্মিত হল না রিজিয়া। এই নিয়ম তার প্রাসাদের। প্রয়োজন ছাড়াও অনেক জিনিষ ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। সোনার কারুকার্য করা রেকাবীতে থোলো থোলো রক্তের মত রাঙা টসটসে আঙুর। তাজা রক্তের মতো আরও লালবর্ণের বড় বড আপেল। কমলা, বেদানা, কলা, কাশ্মীরী মেওয়া।

সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সেরাজী সরাবের পাত্রটি তুলে নিল রিজিয়া। তারপর কি ভেবে যথাস্থানে নামিয়ে রাখলো।

কোনদিন সে সরাব পান করবে বলে চিন্তাই করেনি। আর আজ এমন অবস্থা হয়েছে তার, যার জন্যে তাকে সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে আগামী সমস্যার হাত থেকে সাময়িক অব্যাহতি নিতে হবে? কিন্তু সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে মুসলমান সমাজের উচ্ছৃঙ্খল সুলতানদের মতো বিলাসিতার পঙ্কে ডুবে যাবে? কিন্তু উপায় কি? বিদেশী মুসাফেরকে ভালবেসে নিজেকে মনে মনে সমর্পণ করে দিল্লীর সুলতানার মৃত্যু তো সেই সময়েই হয়েছে। আর সাবধানতা অবলম্বন করে নিজেকে বাঁচানোর প্রয়াস কোথায়?

সরাব, নাচগান, খুশীর পেয়ালায় হৃদয়ের মধুময় সুগন্ধ কুসুমবাস পুরে নেশাসক্ত হবার সময় এটা। এই ভেবে হঠাৎ মনস্থির করে নিয়ে স্বর্ণপাত্রে ভ্রবার সেরাজী সরাব ঢেলে রিজিয়া পান করে নিলো। তারপর আনন্দে চঞ্চল হয়ে ঘণ্টাধ্বনি করে ফিরোজাকে ডাকলো। ফিরোজা মুহূর্তে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিস্মিত ভঙ্গিতে রিজিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল।

রিজিয়া আরো একবার সেরাজী সরাবের পাত্র মুখে তুলে ফিরোজার দিকে তাকিয়ে বলল—আমার সঙ্গে একবার কারাগারে চলো।

ফিরোজা আরো একবার বিস্ময়ে তার দুটি আয়ত চোখে সুলতানার দিকে তাকিয়ে থাকলো। এতরাত্রে কারাগারে! সুলতানা সরাব পান করছে! সেকি স্বপ্ন দেখছে না, জেগে আছে?

কিন্তু ফিরোজা কোনদিনই সুলতানার কাজের কোন কৈফিয়ৎ নেয় না, আজও নিল না। শুধু নিঃশব্দে রিজিয়ার কথায় সায় দিয়ে তার হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলো।

হঠাৎ রিজিয়া ফিরোজার দিকে তাকিয়ে খুশীর আনন্দে তাকে নিজের সুকোমল হাতের বেষ্টনে জড়িয়ে ধরলো—জড়িয়ে ধরে ফিরোজার কানে কানে বলল—আমি দিওয়ানা হয়ে গেছি ফিরো। আমি হারিয়ে গেছি। বলতে বলতে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেলো।

ফিরোজা কোন কথা বলছে না দেখে সে ফিরোজাকে ঝাঁকি দিয়ে বলল—আজ কিছু বল্ তুই। আজ কিছু না বললে যে আমার দিল্ ঠিক থাকছে না। কেমন যেন দিল্‌টা ধড়ফড় করছে।

ফিরোজা মৃদু হেসে শুধু বলল—তুমি মরেছ সুলতানা।

সেই গভীর নিশীথে দুটি রমণী দুটি কালো বোরখায় নিজেদের আচ্ছাদিত করে হাতে একটি প্রজ্জ্বলিত দীপ নিয়ে কারাগারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তাদের দেখে কারাগারের প্রহরী চমকে উঠলো। ঘুমের জড়তা চোখে নিয়ে সে রাতের শেষপ্রহরকে অতিক্রম করছিল। আচমকা এদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সজাগ হয়ে উঠলো। বলল—হুঁশিয়ার।

মৃদু হেসে রিজিয়া বোরখা থেকে মুখটি বাইরে বের করে প্রজ্বলিত দীপের সামনে ধরে প্রহরীকে মৃদুস্বরে বলল—দ্বার খুলে দাও বেন্‌কাশিম।

বেন্‌কাশিম সুলতানাকে সামনে দেখে আর কালবিলম্ব না করে কারাগারের দ্বার উন্মোচন করে দিল।

দূর থেকে দেখতে পেল রিজিয়া সেই অসমসাহসী মুসাফের বিদেশীকে। বসে আছে কারাগারের এক কোণে নিঃঝুম হয়ে। যেন একটি পাহাড় হাত-পা গুটিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে কারাগারের এক কোণে। যখন উঠে দাঁড়াবে তখন এই ক্ষুদ্র কারাগৃহ তার সে বিশাল দেহ ধরে রাখতে পারবে না, ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে যাবে এই ক্ষুদ্র কারাগার ভেদ করে। রিজিয়া ফিরোজাকে বাইরে অপেক্ষায় রেখে নিজে একা ঘরে ঢুকেছিল। কয়েক পা এগিয়ে এল জালাউদ্দীন ইয়াকুতের দিকে। তারপর তার উপস্থিতি জানাবার জন্যে কথা কয়ে উঠলো—বন্দী তুমি কেমন আছো?

ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে স্বল্প আলোর একটি বর্ত্তিকা দেয়ালের এক কোণে রাখা আছে। তা থেকেই যে একটু আলো ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তা খুব পর্যাপ্ত নয়। দিল্লীর কারাগারের বর্ণনা দেবার মতো কিছুই নেই। পরিচ্ছন্ন শুধু ঘরটি। মেঝের ওপর একটি তৈলসিক্ত মলিন বালিশ ও কম্বলের মতো একটুকরো মলিন শয্যা পাতা আছে। ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে একটু আলোর শিখা যেন ও কিছু নয়। যেন অন্ধকারকে উপহাস করবার জন্যে আলোটি এনে রাখা হয়েছে। তবে আলো কয়েদীর ঘরে দেওয়া হয় না সম্ভবত বিদেশীকে একটু উঁচুদরের আসামী ভেবে ঐটুকু দয়া করা হয়েছে। মনে মনে হাসলো রিজিয়া। যে রিজিয়ার পাণিপ্রার্থনা করার সাহস করে সে যে সামান্য আসামী নয় এই অনুমানে তাকে একটু খাতির করা হয়েছে।

রিজিয়া আরও দেখল ঘরের আর একটি কোণে বিদেশী মুসাফেরের জন্য খাবার রাখা আছে; সামান্য অল্প একটু খাদ্য। যা কয়েদীর জন্য বরাদ্দ। কিন্তু সেই খাদ্যের দিকে তাকিয়ে রিজিয়ার গা ঘিন ঘিন করে উঠলো। এমন খাদ্যও মানুষের জন্য দেওয়া হয়? কয়েদী যে মানুষ, তারা অপরাধী বলে জন্তু নয় এটুকু বোধ কারারক্ষীর থাকা উচিত। মনে মনে রিজিয়া ঠিক করলো—কালই এই খাদ্যের জন্য মন্ত্রীকে তাগাও আদেশ দিতে হবে। বিদেশী মুসাফের যে এ খাদ্য খায়নি তার জন্যে রিজিয়া খুশী হলো।

এত কথা রিজিয়ার মুহূর্তে ভাবা হয়ে গেল। কিন্তু বিদেশী মুসাফেরের কাছ থেকে কোন উত্তর এল না। সে কারাকক্ষের এককোণে যেমনি নিঝুম হয়ে বসেছিল তেমনি বসে রইলো। শুধু রিজিয়ার কথায় একটু নড়েচড়ে বসলো কিন্তু তার দিকে ফিরে তাকালো না।

রিজিয়া মনে মনে একটু অপমানিত বোধ করলো। এমন অপমান অন্য সময়ে অন্য কেউ করলে তার শাস্তি রিজিয়া বেশ ভালভাবেই দিত। কিন্তু ইয়াকুতের এই অবহেলায় সে শুধু মৃদু হাসলো, হেসে কালো বোরখাটা মাথা থেকে খুলে হাতে নিয়ে,

বলল—বিদেশী আমি সুলতানা। তোমার সঙ্গে আমার কিছু বার্তচিজ্ঞ করার আছে। তার আগে জিজ্ঞেস করি তুমি খানা খাওনি কেন?

এ কথায় মুসাফের ফিরে ঘৃণিত দৃষ্টিতে খানার পাত্রের দিকে তাকালো তারপর কোন কথা না বলে মুখটা অন্যপাশে ফিরিয়ে নিলো।

রিজিয়া মুসাফেরের মনের অবস্থা বুঝে কাতর হয়ে উঠলো। কাতর ভাব গোপন না করে মুসাফেরের আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো—খানা খাবে? আমি পাঠিয়ে দেবো কিচ্ছু।

হঠাৎ মুসাফের তার দুটি আয়তচোখ তুলে ক্ষুব্ধস্বরে বললো—বহুৎ মেহেরবাণী সুলতানা। আমার কিছু প্রয়োজন নেই।

রিজিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—তোমাকে কাল মুক্তি দেবো ভাবছি—মুসাফের তুমি কি মুক্তি পেলে খুশী হবে?

জালাউদ্দীন ইয়াকুত তাচ্ছিল্যভাবে হেসে বললো—কেন সুলতানা কি অপরাধীর বিচার করতে ভুলে গেলেন?

রিজিয়া যেন কেমন অস্থির হয়ে উঠলো—না—না বিদেশী তুমি বুঝতে পাচ্ছো না। আমি তোমাকে শাস্তি দেওয়ার কথা কখনও ভাবিনি। শুধু আমি তোমাকে মিনতি করছি তুমি সুলতানার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা মন থেকে মুছে ফেলো। দিল্লীর সুলতানীর অনেক কাজ। তার জীবন শাদীর জন্য নয়। রাজ্য পরিচালনার জন্য তার জন্ম। সে সারাজীবন ধরে রাজ্য-পরিচালনার মেহনত করে এসেছে, শাদীর জন্য না। তুমি যদি অন্য কিছু চাও আমি দেবার চেষ্টা করবো তবু ও আশা মন থেকে মুছে ফেলো। আমি তোমাকে অশ্বশালার পরিরক্ষক করে দেবো।

হঠাৎ ইয়াকুত পঞ্চাশ ইঞ্চি বুকের ছাতি নিয়ে পাহাড় দেহ দাঁড় করিয়ে সেই ক্ষুদ্রঘরের পরিসরকে সঙ্কুচিত করে দারুণ রবে হেসে উঠলো। তার হাসিতে তার সমস্ত শরীর এমনভাবে আন্দোলিত হতে লাগলো যা দেখে রিজিয়ার ছোট্ট বুকটি কুঁকড়ে উঠলো। হাসি প্রশমিত হলে ইয়াকুত বলল—বহুৎ সেলাম সুলতানাজী, হাবসী সর্দার কারও অনুগ্রহের আশা করে না।

তাহলে তুমি কি পেলে খুশী হবে বলো আমি তোমায় তাই দেবো।

আমি চাই দিল্লীশ্বরীর হৃদয়!

সে পেলে তোমার কিছু লাভ হবে না মুসাফের। দিল্লীশ্বরী শাদি করলে এ সিংহাসন আর তার থাকবে না। তাকে উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী সুলতানা বলে ষড়যন্ত্র করে সিংহাসনচ্যুত করবে। তুমি শুধু রিজিয়াকে চাও, না তার সঙ্গে সিংহাসনও চাও?

আমি শুধু সুলতানাকে চাই।

কিন্তু সিংহাসন ছাড়া সুলতানার মূল্য কোথায়? আজ যার জন্যে তোমার এই চাওয়া, সিংহাসনচ্যুত হলে সে সুলতানার মূল্য তো সাধারণ জেনানার মতো হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমার মহলে অনেক সুন্দর বাঁদী আছে, তুমি যদি তাদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে চাও আমি তার জন্যে সাহায্য করতে পারি।

সুলতানা সাহেবাকে তার জন্যে ধন্যবাদ। আমি সুলতানাকে ছাড়া আর কারও কথা ভাবি না।

রিজিয়া আরও অধৈর্য হয়ে বললো, তুমি বুঝতে পাচ্ছো না বিদেশী। আমি যদি কাল দরবারে তোমার ঔদ্ধত্যকে সমর্থন করি তাহলে আমার ভায়েরা ওৎ পেতে বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা আমার দুর্নাম রটিয়ে রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করবে। তা ছাড়া আমি রাজ্যের মধ্যে বিয়েশাদী বন্ধ করে দিয়েছি। বিনা হুকুমে কেউ ঐ ধরণের উৎসব করলে কারাবাস। এখন যদি আমি তোমাকে সমর্থন করি তাহলে রাজ্যের লোকেরা আমাকে কি মনে করবে?

কাল থেকে উৎসবের ঢালাও আদেশ দাও।

তুমি যদি সুলতান হতে তাহলে মিনিটে মিনিটে তোমার আদেশ পরিবর্তন করতে পারতে?

ইয়াকুত আর কিছু বলবার আগেই রিজিয়া কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ইয়াকুতের হাত ধরলো। কাতর স্বরে বললো, তুমি কি বুঝতে পারো না, আমি দিল্লীর সুলতানা, আমি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারি নে।

ইয়াকুত রিজিয়ার মানসিক অবস্থা বুঝলো। তা ছাড়া সুলতানার কোমল হাতের বন্ধনিতে তার বলিষ্ঠ হাতটি যেন কেমন মোহের সঞ্চার করছিল। ইয়াকুত আর একটু সাহস করে রিজিয়াকে আপন বক্ষের ওপর স্থাপনের জন্য হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গেল। রিজিয়া তাড়াতাড়ি একটু সরে গিয়ে মৃদু হাসলো, হেসে বললো—এত সাহস ভাল নয় বিদেশী।

ইয়াকুত হাসতে হাসতে বললো, আমি জানতুম আমার আরজি মঞ্জুর হবে।

রিজিয়া তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে বললো, উঁহু একথা যেন কেউ না জানে। এখন গোপন থাকবে এ সম্বন্ধ। সময় হলে সুলতানা নিজেই জানাবে তার রাজন্যবর্গকে। এখন জালাউদ্দীন ইয়াকুত অশ্বশালার পরিরক্ষক ও সুলতানার পার্শ্বচর।

ইয়াকুত কুর্নিশ করে বললো—যো হুকুম জাঁহাপনা। সুলতানার বহুৎ মেহেরবাণী।

রাত্রির শেষের প্রহর আগতপ্রায়। নিস্তব্ধ কারাকক্ষের প্রস্তর প্রাচীর ভেদ করে কার যেন দরদ ভরা কণ্ঠের গান রিজিয়ার কানে গিয়ে পৌঁছলো। কান পেতে সে মধুমাখা কণ্ঠের গান শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গেল। মসজিদের প্রাঙ্গণে বসে ফকির সাহেব প্রিয়মিলনের আকুতিভরা সুরে গান গেয়ে চলেছেন।

আজ তার এ গান শুনে রিজিয়ার চোখের দুই কোণায় জল টলমল করতে লাগলো। মনে প্রশ্ন জাগলো, ফকির সাহেব কি কোনদিন ভালবেসে দিওয়ানা হয়ে গিয়েছিল? প্রিয়াকে না পেয়ে প্রিয়ার জন্যে নিশিদিন ধরে তার এই আকুলতা!



ছোটবেলা থেকেই শুনছে রিজিয়া ফকির সাহেবের এই গান। পিতা আলতামাস তখন দিল্লীর সিংহাসনের একচ্ছত্র সম্রাট। মায়ের মহলে রাত্রিবেলা মায়ের কাছে শুয়ে কতদিন মাকে বলেছে রিজিয়া, ফকিরসাহেব কাঁদে কেন মা? সঠিক জবাব পায়নি সেই ছোট্ট মেয়েটি। আজ বুঝছে কেন সে জবাব সেদিন তার বোধগম্য হয়নি। সুলতানা হয়েও রিজিয়া বোঝেনি ফকির সাহেবের কান্নার অর্থ। আজ সে ভালভাবেই বুঝছে।

রিজিয়া আবার কান পাতলো। ফকীর সাহেব গান গাইছে না। ফকীর সাহেব সত্যিই কাঁদছে। তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কান্নার ঢেউ মোচড় দিয়ে দিয়ে বুক ঠেলে গলার ওপর উঠে আসছে। সে কাঁদছে না তাকে কাঁদাচ্ছে কেউ। কে কাঁদাচ্ছে তাকে? সুলতানার ইচ্ছে করলো—ফকীর সাহেবকে ডেকে জিজ্ঞেস করে কে তোমায় কাঁদায় বলো আমি আমার সুলতানার শক্তি দিয়ে তাকে উদ্ধার করে এনে তোমার কাছে পেশ করবো। ফকীর সাহেবের কণ্ঠ থেকে তবু নিঃসৃত হল।

'বেশেকনদ্ দস্তে কে খম্ দর গর্দন-ই ইয়ারে নাওদ্।
কুর বা-চশমে কে লজুংগীর-ই দীদারে নাওদ্॥'

আলতামাসের বেগম ছিল অনেকগুলি। তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে রমণীর রূপসুধা আকণ্ঠ পান করবার জন্যে রমণীর যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলেন নি। তবে রাঙা টুসটসে খুবসুরৎ লেড়কীর অপরূপ দেহভরা যৌবন দেখলে তাকে বেগম করে এনে মীনামহলে ঢুকিয়ে দিতেন। মীনা মহলে বাছা বাছা সুন্দরীদের অনেক দেখেছে রিজিয়া ছোটবেলায়। সত্যি, সে সৌন্দর্যের হাট দেখে সেদিন রিজিয়া অবাক হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভিন্ন ভিন্ন যৌবন। কোনটি গোলাপী, কোনটি সাদা দুধ-আলতা, কোনটি কৃষ্ণবর্ণ, কোনটি তামাটে বর্ণ। কিন্তু প্রত্যেকটির শরীরের বাঁধুনি অপরূপ। যেমন বক্ষসুধা। তনুর লাবণ্য। নিতম্বের অপরূপ ভঙ্গিমা। চোখের দৃষ্টিতে মদির স্বপ্নাভা। রসাক্ত অধরের মধুর আকর্ষণ।

আলতামাস যে রুচিশীল ব্যক্তি ছিলেন তা তার এই মহলের সৌন্দর্য বিচারে প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু রিজিয়ার মা এখানে থাকতেন না। এই মহলের এই সুন্দরীদের থেকে তিনি নিজেকে আলাদা করে নিয়ে অন্যত্র থাকতেন। তিনি এই মীনা মহলের বেগমদের মনে মনে ঘৃণা করতেন। স্বামীর চরিত্রের এই দিকটায় তার কোন কিছু করার ছিল না বলে তিনি মনে মনে আহত হতেন।

অবশ্য মনে মনে এই বলে তিনি নিজেকে আশ্বাস দিতেন যে সুলতানের হাজারটা বিবি না থাকলে সে সুলতানের সম্মান রক্ষা হয় না। সুলতান একটি নারীর প্রেমের মোহিনী বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। আর লক্ষ লক্ষ নারীর যৌবন তারই কর্মচারীরা লুটেপুটে খাবে, তিনি তাই চোখ মেলে দেখবেন কিন্তু হাত বাড়িয়ে কখনও গ্রহণ করবেন না অন্ততঃ এরকম কোন আদর্শবানের কথা মুসলমান সুলতানের ইতিহাসে লেখা নেই। তাই আলতামাসের এই বেগম প্রীতি ক্ষমার চোখেই দেখতে হয়।

কিন্তু তবু প্রধানা মহিষী রিজিয়ার মা ক্ষমা করতে পারেননি। তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার জন্যে স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা করেছেন। আর তার জন্যেই তৈরী হয়েছে রাজপ্রাসাদের পাশে প্রধানা বেগমের জন্য খুসকৃফিরোজী নামে প্রাসাদ। রিজিয়ার মায়ের নামে নাম দিয়ে এই প্রাসাদ তৈরা হয়। আলতামাস প্রধানা বেগমকে সবচেয়ে ভালবাসতেন। এবং তার মনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ভিন্ন প্রাসাদ তৈরী করে তাকে ভিন্ন বাসের সুযোগ দিয়েছিলেন।

সেই প্রাসাদেই রিজিয়া জন্মেছে। বড় হয়েছে। ছোটবেলার শিশুমনের দিনগুলি এই প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে কেটেছে। এই প্রাসাদের স্মৃতি তার সর্ব অঙ্গের সবটুকু জায়গায় মিশে আছে। তার ছোটবেলাকার খেলার সাথীর মতো এই প্রাসাদের সর্বপ্রস্তরময় অলিন্দ। তাই যখন সে সুলতানা হল তখন সে এই প্রাসাদের মায়া কাটাতে পারলো না। এই প্রাসাদেই সুলতানার বাসস্থান নির্দিষ্ট হলো। এখানে কয়েকজন বাঁদী সমবিহারে রিজিয়া স্বতন্ত্র এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রাখলো। এখানে পুরুষের কোন অধিকার নেই। তবে রাজপ্রাসাদ থেকে কারও হঠাৎ প্রয়োজন হলে সে এসে সুলতানাকে সংবাদ দিতে পারবে এমনি একটি যোগাযোগ পথ খুসকৃফিরোজী প্রাসাদের সঙ্গে ছিল। আসলে যে পথটি দিয়ে আলতামাস নিজে এক সময় গমনাগমন করতেন। এখন সেই পথ দিয়েই রিজিয়া রাজদরবারে যাওয়া আসা করে।

সেদিনের প্রভাতটি রিজিয়ার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পরও প্রভাতের সেই মনোরম সময়টিতে প্রকৃতির অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে তার চোখ দুটি জুড়িয়ে গেল। সাধারণত খুব ভোরেই ওঠা অভ্যাস তার। প্রত্যহ ভোরে উঠে সূর্য ওঠার আগের মুহূর্তটি না দেখলে তার প্রতিদিনের কাজ শুরু হয় না। ভোরের সেই স্নিগ্ধ-স্নাত রূপটি, নীলমেঘের আকাশে সূর্য ওঠার মুহূর্তে বড় মনোরম। রিজিয়ার সারাদিন ধরে রাজকার্যের মধ্যে এই রূপটি প্রত্যহ দেখা থাকলে কাজের সময় তার মস্তিষ্কটি সুস্থ থাকে। যেন সে ভোরের রূপটি মনে ধরে প্রভাতের স্নিগ্ধ-শান্ত রূপসী হয়ে ওঠে।

কিন্তু এদিনের ভোর তাকে অন্য এক আস্বাদ দান করলো। নির্ঘুম দুটি চোখে তার কত ক্লান্তি। কিন্তু কারাগার থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে ফেরার পর বড় তৃপ্তিতে সে শয্যার ওপর ঢলে পড়েছিল। নরম মখ্‌মলের শয্যায় তার সুরভীমাখা সৌন্দর্যেভরা দেহটি বড় আরামেই শয্যা নিয়েছিল। কিন্তু কতটুকুই বা সে ঘুম! শয্যায় উঠে বসে সে অনুভব করে কোন ক্লান্তি নেই। বিস্ময়ে চিন্তা করে রিজিয়া—আশ্চর্য তো!

মনে অদ্ভুত পুলকের সঞ্চার হয়ে মনের যেন কাণা ভরে উঠেছে। যেন অথৈ জলে সারা দীঘি টলোমলো।

হঠাৎ একটি বাঁদী পাশে এসে কুর্নিশ করে রিজিয়ার কৃপা প্রার্থনা করলো। রিজিয়া আকাশের দিক থেকে চোখ দুটি তুলে বাঁদীর দিকে তাকালো। বাঁদী ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমনি ভয়ই করে প্রাসাদের প্রতিটি প্রাণী। রিজিয়ার মেজাজ ও মর্জি যে সবসময় বোঝা যায় না। তাছাড়া সবসময় যে সে বিরক্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সেইজন্যে সর্বদাই কর্মচারীরা গর্দান যাওয়ার আশঙ্কায় এতটুকু হয়ে থাকে। সেই কথা চিন্তা করে মনে মনে রিজিয়া একটু হাসলো। মুখে একটু কোমলভাব নিয়ে এসে বাঁদীকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো, কিছু খবর আছে সাকী?

হ্যাঁ, বেগমসাহেবা, রাণীবিবি শিকল কেটে ঘর থেকে ছট্‌কে বারমহলে চলে এসেছেন। তাঁকে কেউ আটকাতে পাচ্ছে না। তিনি অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছেন। বেশবাস তার শিথিল হয়ে গেছে। আপনি যদি একবার যান তাহলে বড় ভাল হয়।

রসাপ্লুত অধরটি দাঁত দিয়ে রিজিয়া চেপে ধরলো। দাঁতের তীব্র পেশনে নরম অধরের মাংস কেটে রক্তের বন্যা ছুটতে চাইলো। তীব্র একটি যন্ত্রণা। যন্ত্রণাটি শরীরের রন্ধ্রে পাক খেয়ে খেয়ে কণ্ঠ দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এলো। মুখটি বিস্বাদ হয়ে গেলো। মস্তিষ্কের কোষে কোষে আগুন জ্বলে উঠলো। ইচ্ছে করলো এখুনি চাবুকের আঘাতে এই দুশ্চরিত্রা কলঙ্কিনী রমণীকে রক্তাক্ত করে দিল্লী সাম্রাজ্যের বাইরে করে দেয়। কিন্তু তা যে সে পারে না সে তা ভাল করেই জানে। এই রমণীর ওপর দুর্ব্যবহার করলে মৃত পিতার আত্মার অকল্যাণ হবে। তিনি এই রমণীকে যথেষ্টই ভালবাসতেন।

হঠাৎ চিন্তা থেকে সরে এসে বাঁদীর দিকে তাকিয়ে রিজিয়া মাথা নেড়ে জানালো, তুমি যাও। আমি যাচ্ছি।

বাঁদী চলে গেলে রিজিয়া আবার চিন্তার মধ্যে ঢুকে গেল। পিতা আলতামাসকে আজ প্রতি মুহূর্তে তার স্মরণ করতে হচ্ছে। রাজ্যের চারিদিকে, এই রাজপ্রাসাদের চারিদিকে পিতার প্রতিটি স্মৃতি। প্রতিটি স্মৃতি অবিস্মরণীয়। ভুলতে চাইলেও তবু ভোলা যায় না। ইতিহাসে আলতামাস একজন প্রতিপত্তিশালী শ্রেষ্ঠ সুলতান। অন্তত দাসবংশের সুলতানদের মধ্যে আলতামাসের নাম চিরস্মরণীয়। তিনিই প্রথম শিশু মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করতে পেরেছিলেন। ভারতের মুসলমান রাজত্বের সূচনা তার দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বঙ্গদেশে প্রাধান্য স্থাপন করে ভারতের একাংশের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন।

বাগদাদের খলিফা আল মুস্তানসি আলতামাসের এই প্রতিপত্তি স্বীকার করে নিয়ে ভারতীয় রাজ্যকে মুসলিম সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করেছিলেন। বাগদাদের খলিফা সুলতানের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। আলতামাসকে সুলতান-ই-আজম (মহা

সুলতান) উপাধি দান করেন। খেলাত (মূল্যবান রাজ পরিচ্ছদ) দানে ভূষিত করেন এবং একখানি তরবারি উপহার দিয়ে আলতামাসের তুর্কীনামের সঙ্গে শামসউদ্দীন বা ধর্মসূর্য উপাধি যোগ করেন।

আজ রিজিয়া ভাবে, সেদিন খলিফা সম্মান দিয়ে পিতাকে শ্রেষ্ঠ করেছিলেন বলে তিনি ধন্যবাদের পাত্র কিন্তু সবকিছু উপহারের সঙ্গে আর একটি সম্পদ যে দান করেছিলেন তার জন্য তিনি আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সেদিনের সব কথা রিজিয়া জানে না, সে তখন ছোট। মা মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অসাবধানে যে সব কথা বলতেন তার মধ্যে থেকেই উদ্ধার করে আজ একটি কাহিনী সৃষ্টি করে নিয়েছে।

বাগদাদের খলিফার বিলাস সর্বজনবিদিত। সৌন্দর্য ও সেরা সুন্দরীর হাট ঐ বাগদাদেই। খলিফা আল মুস্তানসি সুন্দরীদের মেলায় বসে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি সুখী লোক। বেহেস্তের নয়ন মনোরম কোন স্বপ্নস্বর্গ আছে কি না জানা নেই, তবে বাগদাদ যে বেহেস্তের চেয়েও মনোরম একথা হলফ করে বলা যায়। সেখানে রং বেরঙের ফুল যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে থাকতো তেমনি রমণীর সৌন্দর্য।

সেই খলিফাই রোশনীকে উপহার দিয়েছিলেন। খলিফা বোধ হয় জানতেন, মুসলমান সুলতান রমণী সৌন্দর্যকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে। অন্য উপহারের চেয়ে এই উপহার যে আলতামাসকে খুশী করবে তা তিনি জানতেন।

আলতামাস সেদিন প্রৌঢ়ত্বের সিঁড়িতে গিয়ে পৌছেচেন। বাগদাদের মহামূল্য উপহার কুর্নিশ জানিয়ে গ্রহণ করে হকচকিত হয়ে গেলেন। রক্তে তার আগুনের স্পর্শ লাগলো। কামমদির চোখে প্রৌঢ় আলতামাস যেন কেঁদে ফেললেন অপরূপ যৌবনকে সামনে দেখে। এতদিন যে হীরা বলে কাঁচকে নিয়ে খেলা করেছেন। কাঁচের সঙ্গে জীবনের উত্তপ্ত দিনগুলি বিদায় নিয়েছে। জীবনের এই উত্তপ্ত দিনগুলি বাজে কাজে ব্যয় করতে হয়েছে বলে তীব্র অনুশোচনায় ক্ষত বিক্ষত হলেন।

রোশনী সামনে দাঁড়িয়ে। আলতামাস হীরার দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ দুটি তাঁর ঝলসে গেল। চোখের ওপর মণিমাণিক্যের জ্যোতি পড়ে প্রৌঢ় আলতামাসের চোখ দুটির দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিল। তবু দেখলেন। দেখলেন দিল্লীর অধিপতি মহাবীর আলবারী তুর্ক শ্রেষ্ঠ আলতামাস।

এত রূপ যার। যে রূপের তুলনা নেই। যে রূপ অন্ধকারে আলো জ্বালে। হৃদয়ের ঘুমন্ত শোণিতে জোয়ার তোলে। সেই রূপবতী বেহেস্তের হুরীকে বাগদাদের খলিফা কেমন করে পাঠালেন? কোন্ পুরুষ এই রমণীর সৌন্দর্য উপভোগ না করে তাকে ছেড়ে দেয়—অন্ততঃ আলতামাসের চিন্তার বাইরে। তাই তাঁর সন্দেহ হলো, তবে কি খলিফা তার সঙ্গে দিল্লাকী করবার জন্যে উচ্ছিষ্ট যৌবনের উপহার দিয়ে তাকে উপহাস করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু খলিফার ওপর শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। বাগদাদের খলিফা যে তার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করতে পারেন না তার অন্যান্য ব্যবহারেই তা প্রমাণ হয়েছে। তিনি যদি আলতামাসের সঙ্গে ছল ও চাতুরীর আশ্রয় নিতে

চাইতেন তবে আলতামাসকে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে 'ধর্মসূর্য' ও 'সুলতান-ই-আজম' উপাধি দিয়ে সম্মান জানাতেন না। খলিফা যে তাকে উচ্ছিষ্ট যৌবন উপহার পাঠিয়ে উপহাস করেননি সে কথা ভেবে আলতামাস খুশী হয়ে উঠলেন। মনে মনে খলিফাকে তারিফ করলেন এই বলে যে, যৌবনটুকু আদর্শ পুরুষ সুলতানকে খলিফা উপহার পাঠিয়েছেন, তামাম দিল্লী সাম্রাজ্যের কোথায় কোন রমণীর সৌন্দর্যের সঙ্গে এর বুঝি তুলনা মেলে না। এমন কি মনে মনে আলতামাস তাঁর বেগমমহলের প্রতিটি বেগম ও বাঁদীর সৌন্দর্য পরীক্ষা করে দেখলেন।

এবার স্পষ্ট ও সোজাসুজি রোশনীর দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন। ফুলের মতো সতেজ তনু দেহটি অল্প নুয়ে একটি ভঙ্গিমায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। সুদৃশ্য ভেলভেটে মোড়া মেঝের উপর যে সুন্দর পা দুটি রাখা ছিল আলতামাস সেইদিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। দুধে আলতা রঙের সুকোমল পা দুটি চাঁপা ফুলের ঔজ্জল্য নিয়ে ভেলভেটে মোড়া ফরাসের ওপর রাখা। আলতামাস চোখ দুটি আস্তে আস্তে তুলে দিলেন পায়ের পাতা থেকে উর্ধাঙ্গে। একটি পাতলা মসলিনের বহুমূল্য ঘাঘরা মেয়েটির নিম্নাঙ্গকে জড়িয়ে আছে। আলতামাস নির্লজ্জের মত হাঁটু থেকে চোখ দুটি আরও গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। কোমর থেকে নিম্নাঙ্গের দিকে আবার দৃষ্টি ঝুলিয়ে দিলেন। বহুদর্শী জহুরীর মতো আবার কোমর থেকে উর্ধাঙ্গে চলে গেলেন।

বারকয়েক নিম্নাঙ্গের ওপর নীচে চোখ দুটো দিয়ে লেহন করে উর্ধাঙ্গে উঠে গেলেন। বক্ষের রূপধারাকে সামান্য ঢাকা রাখবার জন্যে একটি ছোট্ট বহুমূল্য জামা মেয়েটির গায়ে। বুকের ওপর আকাশীরঙের একটি ওড়না। অবহেলা ভরে বক্ষ থেকে খসে পড়ে মাটিতে লুটচ্ছে। আলতামাস বারকয়েক মেয়েটির যৌবন প্রস্ফুটিত বক্ষসুধার দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। মেয়েটির দৃষ্টি আনত। কপাল, চিবুক, অধর, ভুরু, সুরমা আঁকা সুন্দর চোখদুটি দেখলেন। আলতামাস ভাবলেন, রমণীতো তাব বেগমমহলে অসংখ্য আছে। কিন্তু এমনটি কোথায়? একে না দেখলে রমণীর এই রূপের সম্বন্ধে তার একটা ভুল ধারণা তৈরী হয়ে থাকতো। খলিফা বোধ হয় জানতেন, আলতামাস অভাবী। রমণী তাঁর হারেমে অনেক আছে কিন্তু এমনটি নেই। তাই বুঝি তিনি সেরা একটি সুন্দরীকে বাগদাদ থেকে পাঠিয়ে তাকে খুশী করলেন।

কিন্তু এই প্রৌঢ় বয়সে এই সুন্দরীকে নিয়ে তিনি কি করবেন? এর বুকে যে আগুন আছে, এর শোণিতে যে সমুদ্রের মাতন আছে তিনি এই শক্তিহীন দেহে তা উপভোগ করবেন কেমন করে? আলতামাস শুধু শঙ্কিত হয়ে সেই কথা ভাবলেন। ভীত হয়ে রোশনীর অবনত মস্তকের দিকে তাকালেন। আবার বারকয়েক পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

জীবনে অনেক রমণী তিনি পেয়েছেন। যাদের ভাল লেগেছে তাদের বেগম করে বেগমমহলে স্থান দিয়েছেন। সেই বেগমদের গর্ভে তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ

হয়ে গেছে। বেগমরা আজ অনেকেই সন্তানবতী। অনেকেই তার সন্তানাদি নিয়ে লালনপালনে ব্যস্ত। আজ তাঁর অনেক সন্তান, অনেক তাঁর বেগম। কিন্তু কি হলো এসবের জন্য শক্তি ক্ষয় করে? জীবনের এই যে অপব্যয় এর জন্যে আবার নতুন করে আলতামাস শোকার্ত হয়ে উঠলেন। তারপর রোশনীকে নিয়ে বেগমমহলের স্বতন্ত্র একটি কক্ষে স্থান দিলেন। রোশনীর রূপসুধা পান করতে তার নিঃশেষিত শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল।

তারপর একদিন হঠাৎ শুনলেন রোশনী বেগম নেই। পাখী উড়ে গেছে। বিহঙ্গী তার সোনার ডানা মেলে কোন স্বপ্নের দেশে চলে গেছে। কিন্তু আলতামাস সন্ধান নিয়ে জানলেন, রোশনী একটি সামান্য সিপাহীর মহব্বতের রোশনাইতে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে পালিয়েছে। আলতামাস মনে মনে রোশনীকে ক্ষমা করলেন। কারণ জানতেন যে, তিনি রোশনীকে খুশী করতে পারেননি, তাঁর অক্ষমতাই রোশনীর পালানোর জন্যে দায়ী।

কিন্তু প্রকাশ্যে বেগমকে খোঁজার জন্য ঘোড়সওয়ার দেশবিদেশে পাঠালেন। নিজে রোশনীর জন্যে ব্যথিত হয়ে উঠলেন। ব্যথিত অবশ্য আলতামাস সত্যিই হয়েছিলেন। সৌন্দর্য উপভোগ করার শক্তি তাঁর না থাকলেও সৌন্দর্যকে আপন এক্তিয়ারে রাখবার ক্ষমতা তার থেকেও থাকলো না দেখে ব্যথিত হলেন। ঘোড়সওয়ার ছুটলো দিল্লীর যমুনা নদীর পার দিয়ে অনেকদূর। যে পলাতক সিপাই রোশনীকে নিয়ে পালিয়েছিল সেই ইকবাল খাঁ আলতামাসেরই সৈন্যবাহিনীর একজন। ইকবালের সাহস দেখে কিন্তু আলতামাস চমকালেন না। কারণ তিনি জানতেন এর জন্য দায়ী একমাত্র তিনি। তাঁরই অক্ষমতা রোশনীর যৌবনকে খুশী করতে পারেনি। সেইজন্যে রোশনী মরিয়া হয়ে উঠেছে। এক নওজোয়ানকে আপন যৌবনের উপচার নিবেদন করে রোশনী বাঁচতে চেয়েছে। মনে মনে এও ভেবেছিলেন আলতামাস, ওদের দু'জনকে খুঁজে পেলে তিনি ক্ষমা করবেন। এবং যাতে সুলতানের সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয় প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে অনেক দূর দেশে পাঠিয়ে দেবেন। দিল্লীর প্রতিভাশালী একচ্ছত্র সুলতান দাসবংশের সম্মানকে কিছুতে ম্লান করতে দেবেন না। তার অক্ষমতার কথা তার পঙ্গুত্বের বার্তা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হলে ইতিহাসে তিনি অক্ষম সুলতান নাম নিয়ে থাকবেন। তাই মনে মনে ঠিক করেছিলেন ওদের পেলে ক্ষমা করে অনেকদূরে পাঠিয়ে দেবেন। তার স্বভাবের সুন্দর দিকটাই মানুষের চোখে সুন্দর আসন পেয়ে যাবে।

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওদের দুজনকে পাওয়া গেল না। আলতামাসের মনের ইচ্ছা মনের মধ্যেই গুমরে থাকলো। তিনি রোশনীকে না পেয়ে বিরহানলে দগ্ধ হলেন। ত্যাগের বাসনা যে মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল সেই ত্যাগ না করতে পেরে রোশনীর জন্যে যেন দিনের পর দিন পাগল হয়ে উঠলেন।

আলতামাসের সেই দিনগুলির কিছু কিছু ইতিহাস রিজিয়া তার মার মুখে শুনেছে। মা যখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের জীবনকে ধিক্কার দিয়ে অনেক বাজে

কথা বলতেন, তার মধ্যে আলতামাসের সেদিনের কিছু কিছু ঘটনা মার মুখ থেকেই শুনেছে রিজিয়া। পিতা আলতামাস যেন সেদিন বৃদ্ধবয়সে রোশনীর মহব্বতের রোশনাতেই পড়ে মরেছিলেন। পিতার মুখে সেদিন রোশনীর নাম ছাড়া কিছু ছিল না। এত বড় যোদ্ধা, এত বড় সুলতান, যাঁর ভয়ে সমস্ত উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গেরা কাঁপেন; তিনি সামান্যা এক নারীর প্রেমে এমনি করে নিজেকে হারাবেন একথা যে কল্পনাতে আসে না। কিন্তু সেদিন তিনি তাই করেছিলেন। দাসবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান এক নষ্টা নারীর জন্যে রাজকার্য ভুলে গিয়ে হা-হুতাশ করেছিলেন।

তারপর তিনবছর চলে গেছে। হয়ত আলতামাস আস্তে আস্তে ভুলেও গিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন তাঁর সৈন্যরা শত্রুপক্ষীয় একটি ছাউনি অধিকার করে কয়েকটি শত্রু সৈন্য ও কয়েকটি রমণীকে বন্দী করে নিয়ে আসে। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে উদ্ধার করেন তিনি রোশনীকে। আলতামাস দেখেই চিনতে পেরেছিলেন রোশনীকে। কিন্তু রোশনীর আগের সে সৌন্দর্য ছিল না। প্রথম যারা রোশনীকে দেখেছিল তারা এই বর্তমানের রোশনীকে দেখলে হলফ করে বলতে পারবে—এ কখনই সে রোশনী নয়। সেই রোশনীর এই অবস্থা কখনই হতে পারে না। কিন্তু আলতামাস দিনরাত রোশনীর মুখটি মনে করবার চেষ্টা করতেন বলে প্রথম সাক্ষাতেই তাকে চিনে ফেলেছিলেন। শত্রু সৈন্যেরা যে ছাউনিতে রাত্রিবেলা এই রমণীগুলিকে নিয়ে স্ফূর্তি করছিল তাও তিনি শুনেছিলেন। আর রোশনীর চেহারা দেখেও বুঝেছিলেন, বহুপুরুষের স্পর্শে ও বহুরাতের অত্যাচারে সেই দেহের এই রূপ বর্তমানে হয়েছে। একটি নষ্টা মেয়ের ঘৃণ্য রূপ নিয়ে সেদিনের সেই চমক লাগানো সৌন্দর্যকে একেবারে পালটে দিয়েছে।

আলতামাস এই ঘৃণ্য রমণীকে ঘৃণা করে তাড়িয়ে দিলেই ভাল করতেন। মনের সেই হারানো সুখস্বপ্নকে—মহব্বতকে মুছে দিয়ে জীবন থেকে রোশনীর স্মৃতি মুছে ফেললেই আলতামাসকে চেনা যেত। কিন্তু তা তিনি করলেন না। তিনি আবার তাকে ধুয়ে মুছে ঘরে নিয়ে এলেন। বেগমমহলে আবার তাকে স্থান দিলেন। আবার তাকে নিয়ে হারানো দিনগুলি নতুন করে ঝালানোর চেষ্টা করলেন। নতুন করে মালকোষ সুরে তানের ছন্দে হৃদয় মাতানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুর আর সৃষ্টি হল না।

রোশনীকে পিছনের ঘৃণিত জীবনের মাশুল দিতে হলো। রোগ তার শরীরে আগেই বাসা বেঁধেছিল। দুশ্চরিত্র সৈনিকদের সাথে মেলামেশায় শরীরের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক আগেই হয়েছিল। হয়ত প্রাসাদের বিলাসীজীবনে ফিরে এসে সুলতানের ক্ষমা পেয়ে তা প্রকট হয়ে ধরা পড়লো। দিনের পর দিন রোশনীর সারা শরীরের চারিদিকে রোগের প্রকাশগুলো বীভৎস হয়ে উঠলো। সে পাগল হয়ে গেল।

রাজ্যবৈদ্য এল মহলে। দিনের পর দিন ওষুধের হের-ফের চলতে লাগলো। সুলতান ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু রোশনী ভাল হল না। রোশনী সম্পূর্ণ

পাগল হয়ে গেল। রোশনী পাগল হল হয়ত তার ঘৃণ্য জীবনটি সুলতানের সহানুভূতি পেয়ে। সুলতান যদি এমনি করে তাকে ক্ষমা না করতেন, তাকে আবার ভালবাসা না দেখাতেন—হয়ত নিজে পাগল না হয়ে মরমে মরে যেতো। কিন্তু পাগল হয়ে গেল রোগের জন্য নয় সুলতানের ভালবাসা পেয়ে। এই সুলতান ও এই বিলাসী জীবনকে ছেড়ে সে যৌবনকে উপভোগ করতে গিয়ে যে অন্যায় করেছে তার ক্ষমা নেই বলে সে পাগল হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত এই পাগলীকে শৃঙ্খলিত করে ঘরে বদ্ধ রেখে আলতামাসকে রোশনী বেগমের মহব্বতের শেষ পরিণতি তৈরী করতে হল। তবু তাঁর শান্তি, যে রোশনী কাছেই আছে। রোশনী এখন রোগাক্রান্তা, অক্ষমা। তবু সে চোখের সামনে আছে। রোশনীর রূপহীনা বিকৃত আকৃতি দেখে মনে মনে সুলতান খুশী। যৌবন থাকলে যে রোশনীকে ধরে রাখা যেত না, সেই যৌবন এখন বিকৃত হয়ে রোশনীকে সুলতানের হারেমে বদ্ধ করেছে। এখন রোশনী তাঁর। অন্য কারুর নয়। এই আনন্দে সুলতান আলতামাসের শেষের দিনগুলি, স্মরণীয় হয়েছিল। বীরের বীরত্বকে কেউ চূর্ণ করতে চাইলে যে বীর কখনও ক্ষমা করে না ; একদিন তার প্রতিশোধ নেয়। আলতামাস ছিলেন বীর, রোশনীর যৌবন চূর্ণ হতে তিনি নিজের জয়ই মেনে নিলেন। সেই আনন্দে তিনি একটি ভারী পাথরকে বেগম মহলে রেখে তিনি হাঁফ ছাড়তে চাইলেন।

সুলতান আলতামাস চলে গেলেন। বেগম মহলের অনেক বেগম আজ গত। রাজ্যের অনেক ওলোট পালট হয়ে গেছে কিন্তু সেই পাগলী রোশনী এখনও শৃঙ্খলিত হয়ে বদ্ধঘরের মধ্যে বসে আছে। রিজিয়া বেগমমহলে কখনও গেলে রোশনীকে দেখলে কিছুতে পিতা আলতামাসকে ক্ষমা করতে পারে না। আজও তাই পারলো না পিতাকে ক্ষমা করতে। মনে মনে পিতার এত গুণের মধ্যে দোষটুকুর কথা ভেবে নিজেই বেদনাহত হলো।

সুন্দর ভোরটি তার কাছে যে স্নিগ্ধরূপের মায়া বিস্তার করেছিল। সেটুকু মন থেকে মুছে গেল। মনের ওপর ভেসে উঠলো রোশনীর বীভৎস ঘৃণ্য মুখের প্রতিচ্ছবি। তামাম রাজ্যের চারিদিকে যেখানে পাপ, উচ্ছৃঙ্খলতা দিনের পর দিন নদীর স্রোতের মতো ঢেউ সৃষ্টি করে ছড়িয়ে পড়েছিল, রিজিয়া সিংহাসনে বসে রাজদণ্ডের ভয় দেখিয়ে তা কমানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার প্রাসাদের উজ্জ্বল দীপালোকে যে পাপের ছড়াছড়ি আলতামাসের সাক্ষ্য হয়ে আছে তাদের কমাতে পারেনি। বাইরের লোক সে কথা জানে, সুলতানার রাজদণ্ডের ভয়ে বলতে সাহস করে না। কিন্তু সুলতানা নিজে জানে যে তার প্রজাবর্গরা আড়ালে তার নামে কি বলে? কিন্তু উপায় নেই। পিতা তার নমস্য ব্যক্তি। পিতার শিক্ষায় আজ সে সিংহাসনকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি যদি নিজের হাতে রণকৌশল না শেখাতেন তাহলে রিজিয়া আজকে এক একটি যুদ্ধ জয় করতে পারতো না। পিতার রাজ্য পরিচালনার পদ্ধতি অনুসরণ না করলে কবে সে সিংহাসনচ্যুত হয়ে যেতো। পিতার অনেকগুণ। কিন্তু গুণ ছাড়া যে দোষগুলি আজ রিজিয়াকে পীড়ন করে তার জন্তে রিজিয়া সর্বদা আহত

হয়ে ওঠে। পিতা যেন রিজিয়াকে সংজীবন যাপন করতে দেবেন না বলেই তাঁর পাপের দৃশ্যগুলি চোখের ওপর ধরে রেখে গেছেন। রিজিয়ার বৈমাত্রেয় ভায়েরা যে উচ্ছৃঙ্খলতায় নেমে গেছে তাও যেন পিতাকে অনুসরণ করে। অথচ আলতামাস কখনও সেরাজী সরাবের নেশায় নিজেকে রাঙিয়ে নর্তকীর নৃত্যের মধ্যে দিয়ে তাদের যৌবন-লুব্ধ দেহের দোলানি উপভোগ করেননি।

মন থেকে চিন্তা দূর করে রিজিয়া তাড়াতাড়ি 'খুসক ফিরোজী' প্রাসাদ ছেড়ে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললো। রাজপ্রাসাদের পিছনের অংশে বেগমমহল। বেগমমহলের একটি ভিন্ন অংশে রোশনীর ঘর। যে ঘরে সে বদ্ধ অবস্থায় জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে চলেছে।

বেগমমহল দিয়ে যেতে যেতে আর একজনের কথা মনে পড়লো রিজিয়ার। শাহতুর্কান। সুলতান আলতামাসের এক তুর্কী ক্রীতদাসী। এই ক্রীতদাসী পরে আলতামাসের বেগম হয়ে বেগমমহলে স্থান পেয়েছিল। রুকনউদ্দীনকে জন্ম দিয়ে এই ক্রীতদাসীবেগম মাতৃত্বের গৌরবে সুলতান আলতামাসকে যথেষ্ট পীড়ন করেছে। সুলতান জীবিত অবস্থায় শেষের দিনগুলি এই শাহতুর্কানের অত্যাচারে সর্বদা শঙ্কিত হয়ে থাকতেন। তার আরজি: সুলতানের মৃত্যুর পর তার পুত্রই যেন সিংহাসন পায়।

কিন্তু শাহতুর্কানের হাজার অত্যাচারেও মৃত্যুর সময় সুলতান শাহতুর্কানের পুত্রকে সিংহাসন দিয়ে যাননি। মরবার সময় তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গিয়েছিলেন, যেন রিজিয়াই তাঁর অবর্তমানে সিংহাসনে বসে।

কিন্তু আমীর ওমরাহেরা একজন অবলা কুসুমকোমলা নারীর অধীন হতে চাইলেন না। তখনকার দিনে রমণীরা পর্দার বাইরে এসে রাজ্য পরিচালনা করবে—এ কথা স্বপ্নেও চিন্তা কবা যেত না। তাই যখন আলতামাস মরবার সময় তার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেলেন তখন আমীর ওমরাহেরা সুলতানের মতিভ্রম হয়েছে বলে ধরে নিলেন। তা ছাড়া সুলতান কন্যার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহের জন্যেই এরূপ অসঙ্গত ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে সবাই সাব্যস্ত করলেন।

এর মধ্যে অবশ্য রুকনউদ্দীনের মা শাহতুর্কানের যথেষ্ট হাত ছিল। শাহতুর্কান ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর জন্যে রিজিয়ার বিরুদ্ধে দল তৈরী করলেন। মনে মনে সুলতানের নির্বুদ্ধিতার যথেষ্ট সমালোচনা করে মৃত সুলতানের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে আমীর ওমরাহদের খেপিয়ে তুললেন।

তাঁর মনস্কামনা একদিন পূর্ণ হল। রুকনউদ্দীনকে আমীর ওমরাহরা সসম্মানে সিংহাসনে বসালেন। নামে অবশ্য রুকনউদ্দীন সিংহাসনে বসলো, আসলে তার গর্ভধারিণী মা শাহতুর্কানই রাজ্য পরিচালনার ভার নিলেন।

সেদিন খুসক্‌ফিরোজী প্রাসাদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে রিজিয়া শুধু আল্লাকে ডেকেছে। মৃত পিতার কথা সর্বদা স্মরণ করেছে আর ভয়ে সর্বদা কেঁপেছে—এই বুঝি শাহতুর্কান শাণিত কৃপাণ নিয়ে তার দিকে ছুটে আসে।

খুসকফিরোজী প্রাসাদে বসেই রিজিয়া বিমাতা শাহতুর্কানের নিষ্ঠুর ও কড়া মেজাজের পরিচয় পেয়েছে। রমণীর হৃদয় যে এত রূঢ় ও কঠিন হতে পারে— রিজিয়ার জানা ছিল না। শাহতুর্কানের ভয়ঙ্কর মূর্তি আজ রিজিয়ার দৃশ্যপটে চিত্রিত হলে সে শিউরে ওঠে।

শাহতুর্কান বেগমমহল থেকে তাঁর সতীনদের বের করে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করলেন। তাঁর সেই নারীহত্যার নৃশংসতা দেখে আমীর ওমরাহরা শিউরে উঠলেন। সুলতান আলতামাসের অতি আদরের সুন্দরী বেগমরা এমনি নৃশংসভাবে শাহতুর্কানের হাতে জীবন দিতে বাধ্য হলো। তাদের কেউ রক্ষা করতে পারলো না। সুলতান আলতামাস হয়ত বেহেস্ত থেকে তাঁর আদরের বেগমদের এমনি দুর্দশা দেখে রোদন করলেন কিন্তু তাদের বাঁচাতে পারলেন না। খুসকফিরোজী প্রাসাদে নিজেকে গোপন রেখে রিজিয়া শুনেছে বেগমমহলের বেগমদের আর্ত চীৎকার। কিন্তু তার করবার সেদিন কিছুই ছিল না। তখন তার অবস্থা ঐ বেগমদের মতোই নিরুপায়।

কিন্তু আলতামাসের অন্যতম পুত্র কুমার কুতুবউদ্দীনের চক্ষু উৎপাটিত করে নিতে ও মুইজুকে হত্যা করতে জনসাধারণ আর চুপ করে থাকতে পারলো না। তারা ক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে মাতা ও পুত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। শেষে মাতা ও পুত্র যখন রিজিয়াকে হত্যা করবার জন্যে ষড়যন্ত্র করলো, সেই সময় রিজিয়া কোশলে মসজিদ প্রাঙ্গণে রুকনউদ্দীনকে জনসাধারণের দ্বারা হত্যা করালো ও পিথোরা দুর্গে শাহতুর্কানকে বন্দী করলো।

এই সেই বেগমমহল। এরই নিম্নপ্রকোষ্ঠের কারাগারে শাহতুর্কান পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে নিষ্ফল আক্রোশে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছে।

রিজিয়া তখন সবে সিংহাসনে বসেছে। সে জানে, এই বেগমমহলের নিম্নপ্রকোষ্ঠে পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে শাহতুর্কানের ক্ষুব্ধ চীৎকার ও আস্ফালন পাষাণ প্রাচীরকে চৌচির করে ভেঙে দিতে চেয়েছিল। শাহতুর্কান যেন ক্ষুব্ধ সিংহী। তখন যদি সে একবার মুক্তি পেত তাহলে যে রিজিয়ার দেহের মাংস কুরে কুরে খেত এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিংবা শাণিত কৃপাণ দিয়ে সে রিজিয়ার দেহ খণ্ড খণ্ড করে পৈশাচিক আনন্দে নৃত্য করতো।

সেই শাহতুর্কান বেগমের প্রাণ ফাটানো চীৎকার আজও বেগম-মহলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনি তুলে সুলতানা রিজিয়াকে সচকিত করে দেয়। শাহতুর্কান এই বেগমমহলের নীচেই অন্ধকার কারাগারে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে অনাহারে, পিপাসায় তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করেছে। রিজিয়া যখনই আসে এই বেগমমহলে তখনই যেন সে শুনতে পায় শাহতুর্কান বেগমের নিষ্ফল চীৎকার। মর্মন্তুদ হাহাকার।

আজ বেগম-মহলে আলতামাসের একটিও বেগম জীবিত নেই। সমস্ত বেগম-মহলের সুন্দর কারুকার্য করা ঘরগুলি সম্পূর্ণ মুক্ত। সেখানে এখন বাস করে বাঁদী ও ও নর্তকী। আর আছে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বদ্ধঘরের মধ্যে রোশনী। ঐ একটি বেগমই এখনও বেঁচে আলতামাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে।

রিজিয়া দ্রুত এগিয়ে গেল রোশনীর উদ্দেশ্যে বেগমমহলের অন্য প্রকোষ্ঠে।

মালিক ইক্তিয়ারউদ্দীন ইতিগীন। এই সুন্দর যুবকটির ব্যবহারে রিজিয়া তার ওপর যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিল। তাকে ঠিক আপন সহোদর ভায়ের মত স্নেহ করতো। যুবকটি ছিল ভীষণ চালাক। লোকের মনের ইচ্ছা টপ্ করে সে বুঝতে পারতো। আর সেইজন্যে রিজিয়া তাকে যথেষ্ট কৃপার দৃষ্টিতে দেখতো। কিন্তু যুবকটির একটি মারাত্মক দোষ ছিল, সুন্দরী বাঁদীদের দেখলে লোলুপ হয়ে চেয়ে থাকত তাদের দিকে। ইতিগীনের এই দোষ রিজিয়ার দৃষ্টি এড়ায়নি। মৃদু হেসে রিজিয়া ইতিগীনকে ঘাতকের শাণিত কৃপাণ দেখিয়ে বলেছে: 'ওদিকে দৃষ্টি দিও না, উচ্ছৃঙ্খলতার শাস্তি আমি কেমন দিই আশা করি তুমি তার প্রমাণ পেয়েছো।'

তবু ইতিগীনকে রাজিয়ার ভাল লাগে। যুবকটি সুন্দর। বয়স কম। ছেলেমানুষের একটি চঞ্চলতা তাকে ঘিরে সর্বদা খেলা করে। ছেলেটি বিলাসী। আতরের সুরভি মেখে সর্বদা মূল্যবান পাতলুন, পাঞ্জাবী পরে মাথায় জরির টুপি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বাঁদীদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে। সুন্দর সুন্দর কথার তুবড়ীবাজী করে তাদের হাসায়। রিজিয়াও তার কথা শুনে হাসে। ইতিগীন সুলতানার রাজসিংহাসনের মর্যাদাকে এতটুকু ভয় করে না। সম্ভ্রম অবশ্য করে, তবে সিংহাসনকে নয় রিজিয়ার অপরূপ সৌন্দর্যকে। রিজিয়া সেইজন্যে এই ছেলেটির বেয়াদপি নীরবে সহ্য করে। এমনটি তো কেউ সাহস করে বলে না?

এই দুঃসাহসের জন্যেই রিজিয়া ইতিগীনকে ভিন্নভাবে স্নেহ করে। যখন রাজ্যের ছোট বড় সবাই হুজুর হুজুর করে তাকে সম্ভ্রম করছে, সেইসময় ইতিগীনের দুঃসাহসিক আত্মীয়তা তাকে যেন নতুন এক আস্বাদ দান করে।

ইতিগীনকে এনেছিল তারই এক তুর্কী-সৈনিক। সৈনিকের কিরকম সম্পর্কে আত্মীয় হয় যেন। ইতিগীনকে এনেছিল একটি কাজের জন্য। সুলতানা যদি ইতিগীনের ব্যবহারে খুশী হয় তাহলে নিশ্চয় তাকে তিনি চাকরী দেবেন। সুলতানা প্রথম-দর্শনে খুশী হয়েছিলেন তা তার মুখের চেহারাতেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু এযাবৎ ইতিগীনকে রিজিয়া কোন কাজ দেয়নি। ইতিগীন কাজ চাইলেই রিজিয়া হেসে বলেছে: 'কাজ করে তুমি কি করবে? কবিতা লেখো। যদি পাঁচটি ভাল কবিতা লিখতে পার তাহলে তুমি একশো আসরফি পুরস্কার পাবে।' ইতিগীন পাঁচটি কবিতা লিখে রিজিয়াকে শুনিয়েছে। রিজিয়া ইতিগীনের কবিতার ভাষা শুনে হেসে লুটোপুটি।

ইতিগীন কবিতা লিখেছে বেগম-মহলের পাঁচটি সুন্দরী বাঁদীর প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে। বর্ণনাগুলি এমনিই উৎকট ও নির্লজ্জ যে রিজিয়ার রমণীয় মুখমণ্ডলে লজ্জার ছায়া পড়েছে। ইতিগীন ছেলেমানুষ। তার মনে যে ঘোরানো কোন ধারণা নেই, অকপটে যা দেখেছে, যা বুঝেছে তাই বর্ণনা করেছে। যদি বোধশক্তি থাকতো তাহলে কখনই এই নির্লজ্জ বর্ণনাগুলি উদাত্তস্বরে চীৎকার করে সুলতানাকে শোনাতো-না। সুলতানা যে বেয়াদপি সহ্য করবে না শাস্তির জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করবে এ ইতিগীন ভাল করেই জানে।

তাই রিজিয়া ইতিগীনের কবিতা পাঁচটি শুনে হাসতে হাসতে মনে মনে ইতিগীনকে ক্ষমা করলো কিন্তু মুখে বললো : কবিতা লিখে আর বাঁদীদের দেহ-সৌন্দর্য দেখে দিন চালালে তো চলবে না, রণকৌশল আয়ত্ত করতে হবে। তরবারী চালোনোর কৌশল শিখতে হবে। কাল থেকে মহম্মদের কাছে তালিম নেবার চেষ্টা করো।

ইতিগীন ভাবলো, বোধহয় সুলতানার কবিতা ভাল লাগে নি বলে এই হুকুম। তাই একান্ত করুণ হয়ে রিজিয়ার গম্ভীর-মুখের দিকে চেয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললো : শাস্তি।

না শাস্তি নয়। একশো আসরফি তোমার পাওনা হয়েছে।

তবে ?

তুমি নওজোয়ান। তোমার শক্তি আছে। সেই শক্তি বাজে কাজে নষ্ট না করে রণকৌশল আয়ত্ব করো।

কবিতা লেখা বাজে কাজ ?

একটু থমকে দাঁড়ালো রিজিয়া। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস শিল্পত্বের শ্রেষ্ঠ অবদান। পিতা আলতামাসও এই শিল্পকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সেইজন্যে তার রাজপ্রাসাদ অলঙ্কিত করেছিল কয়েকজন কাব্যানুরাগী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি। তিনি অনেকের মাসোহারা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করে গেছেন। এখনও অনেকের মাসোহারা নিয়মিত রাজকোষ থেকে বিতরিত হয়। তাদের অনেককে চেনে না রিজিয়া। আবার কাউকে কাউকে চেনে। তাদের অনেকে মাঝে মাঝে আসে। রিজিয়া তাদের শ্রদ্ধা করে। পিতা আলতামাস বলতেন : খেটে-খুটে, পরিশ্রম করে, রণকৌশল আয়ত্ত করে সাম্রাজ্য বানানো যায় কিন্তু সাহিত্যকে খেটে-খুটে তৈরী করা যায় না। ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা না থাকলে কাব্যানুরাগ বা সাহিত্যানুরাগ জন্মায় না। সেইজন্যে যারা এসব করেন তাঁরা নমস্য ব্যক্তি। তাঁদের কখনও অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। আলতামাস জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কখনও এঁদের অশ্রদ্ধা করেননি।

রিজিয়াও তাই অশ্রদ্ধা করতো না। সাহিত্যানুরাগী, কাব্যানুরাগী ব্যক্তিদের সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো। তাঁদের মাসোহারা দিয়ে তাঁদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখতো। তাই ইতিগীনের কথাতে সে একটু চমকালো। তারপর হেসে বললো—না। তবে এ ছাড়াও কিছু রণকৌশল শেখো। কোন কোন সময় তো দরকার হতে পারে।

বেশ কিছুদিন ধরে তাই রিজিয়ার কথায় বাধ্য হয়ে অসি-চালনা, তীর-ধনুক ছোঁড়া, নানান রণকৌশল ইতিগীন শিক্ষা করে। শিক্ষার মাঝখানে একদিন শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে ইতিগীনের অসি-চালনা দেখে রিজিয়া খুশী হয়ে তাকে বাহবা দিয়ে বলে : কবিতা লেখাতেও তুমি যেমন পটু, অসি-চালনাতেও।

সেই ইতিগীন এতদিনে একজন ভাল যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। এখন সে যে হাতে কবিতা লেখে সেই হাতে অসি-চালনাতেও সিদ্ধহস্ত। এবার এই ইতিগীনকে কাজে লাগাতে হবে।

রিজিয়া চিন্তাই করে রেখেছিল। ইতিগীনকে রাজপ্রাসাদের পরিদর্শক করে দিতে হবে। এই কাজই তার উপযুক্ত। রাজপ্রাসাদকে শত্রুর হাত থেকে সাবধানে রাখবার একমাত্র লোক এই ইতিগীন। এখন সে একজন বড় যোদ্ধা। অসির আঘাতে কিছু লোককে আহত করবার শক্তি তার হয়েছে। তা'ছাড়া এর মধ্যে সে প্রাসাদের বিভিন্ন মহলে অবারিত প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছিল। এমন কি রিজিয়ার খাসমহলে যখন তখন প্রবেশ করলেও রিজিয়া কিছু বলে না। রিজিয়া ইতিগীনকে দারুণ বিশ্বাস করতো। একজন পুরুষের এমনি অন্দরমহলে যাতায়াত নিয়ে আমীর-ওমরাহরা রিজিয়ার নিন্দা করতো। কিন্তু রিজিয়া সে সব কথায় কর্ণপাত করতো না। রিজিয়ার একটি গুণ ছিল, সে যে-টা উচিত মনে করতো, সেটার ওপর যত বাধা বিপত্তি আসুক সে তা অগ্রাহ্য করে যেত। তেমনি ইতিগীনের ব্যাপার। ইতিগীন যে দুশ্চরিত্র নয় বা তার যে অন্য কোন দোষ নেই—তা জানতো রিজিয়া। তাই জানতো বলেই রিজিয়া ইতিগীনের অবাধ স্বাধীনতায় এতটুকু বাঁধা দেয় নি। তা ছাড়া ছেলেটিকে তার ভীষণ ভাল লাগতো। এমন সহজ সরল একটি ছেলেকে পাওয়া বড় দুষ্কর।

রিজিয়ার আপন বলতে পৃথিবীতে কেউ ছিল না। বাবা, মা অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। এক আছে, বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন। কিন্তু তাদের সঙ্গে রিজিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। রিজিয়ার সিংহাসন প্রাপ্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা সমস্ত সদ্ভাব ছিন্ন করে দিয়েছে। সেই নিরানন্দ মনে ইতিগীনের এই উচ্ছল প্রাণের সঙ্গ যেন রিজিয়ার গুরুগম্ভীর রাজকার্যকে অনেক সহজ করে দেয়। সেইজন্য রিজিয়া ইতিগীনের বেয়াদপি সহ্য করেও তার আগমন প্রতীক্ষা করে। সে এলে তার প্রাণে কিছুক্ষণের জন্যে হাসির উৎস আসে।

সেই ইতিগীনকে এবার গুরুদায়িত্বের ভার দিতে হবে। রাজপ্রাসাদের পরিদর্শক।

মনে মনে হাসে রিজিয়া। ইতিগীনের এবার বাঁদীমহলে যাতায়াত আরও বেড়ে যাবে। তা যাক্। তবু যুবকটিকে প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে নিঃশঙ্ক হওয়া যায়। অন্ততঃ রিজিয়ার নিমকের বেইমানি করবে না।

জালাউদ্দীন ইয়াকুতকে অশ্বশালা ও হাতিশালার অধ্যক্ষ ও রিজিয়ার পার্শ্বচর নিযুক্ত করার দিন ইতিগীনকেও রিজিয়া রাজপ্রাসাদের পরিরক্ষক নিযুক্ত করে দিলো। দুটি সম্মানীয় ও দায়িত্বপূর্ণ পদগৌরব দুটি অপরিচিত লোকের ওপর ন্যস্ত হতে আমীর-ওমরাহরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু রিজিয়া অটল। সে যা হুকুম দেয় তার যে নড়চড় হয় না—সকলেই তা জানে। তা ছাড়া রিজিয়ার কঠোর রাজ্যশাসন পরিচালনা কারও মতের অপেক্ষা রাখে না। আর এ ছাড়া মনে মনে সে জানে—ইয়াকুত বিদেশী। তাকে এত বড় গুরুদায়িত্ব দিলে রাজন্যবর্গরা কত ক্ষিপ্ত হবে। তা ছাড়া এই বিদেশী মুসাফেরের বেয়াদপি উন্মুক্ত রাজদরবারে প্রমাণিত হয়ে গেছে। সে চায় সুলতানার পাণিগ্রহণ করতে। সেই বিদেশী মুসাফেরকে প্রাণদণ্ডের আদেশ

না দিয়ে তাকে সম্মানীয় পদমর্যাদা দিয়ে ভূষিত করা হলো। তাই রাজন্যবর্গরা অন্তরালের আসল অর্থটি উপলব্ধি করে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

একদিকে ইত্তিগীন। যাকে রিজিয়া ছাড়া কেউ পছন্দ করে না। সে হল রাজপ্রাসাদ পরিরক্ষক। আর একদিকে ইয়াকুত—বিদেশী মুসাফের। ইতিগীনকে জড়িয়ে আমীর-ওমরাহরা রিজিয়ার নামে আগেই অনেক দুর্নাম ছড়াতো। এখন ইয়াকুত এসে উপস্থিত হলো। রিজিয়ার কুমারী জীবনে যে দুটি পুরুষ কুমারী নামের অবমাননা করে তাকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—রিজিয়া যে আর ভাল নেই, সে তার বৈমাত্রেয় ভায়েদের পথ অনুসরণ করেছে—ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক দুর্নাম চারিদিকে রটনা হয়ে রিজিয়ার সম্মানকে ধূলায় মিশিয়ে দিলো।

আর রিজিয়া। রিজিয়া রাতের রহস্যলোকে অন্ধকারময় বাতায়নে দাঁড়িয়ে নির্ঘুম দুটি চোখে আকাশের খণ্ড খণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে ভাবে সে তাহলে সত্যিই নারী। নারীত্বের কামনা বাসনা নিয়েই তার জন্ম। রমণী হৃদয়শোণিতে যে পুরুষের স্পর্শ লোলুপ হয়ে তাকে সমস্ত কর্তব্যের উপরে তোলে, রিজিয়া আজ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। আজ তার মন ইয়াকুতের জন্যে ব্যাকুল।

ইয়াকুতের ঐ বলিষ্ঠ দুই বাহুর মাঝে নিজেকে সমর্পণ করতে পারলে যেন হৃদয়ের বিক্ষুব্ধভাব চিরতরে শান্ত হতো। হৃদয় যেন আজ উন্মুক্ত হয়ে ইয়াকুতের সোহাগ পেতে চায়। ইয়াকুত! ইয়াকুত! বিদেশী মুসাফের। সে আজ ভাগ্যগুণে তুর্কী-সুলতানা রিজিয়ার প্রণয়ী। ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে—রিজিয়া একজন নারী হয়ে রাজ্যপরিচালনার যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা জগতে অবিস্মরণীয়। কিন্তু রিজিয়া যে রমণী। রমণীর আসল ধর্ম পুরুষের ভালবাসা। রিজিয়া রমণীর ধর্মকে এড়িয়ে নিজেকে পরিবর্তিত করতে পারেনি। সে হেরে গেছে। সে পরাজিতা।

আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছরের জীবনে যে একাগ্রতা, যে সহিষ্ণুতা তাকে একটিমাত্র লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে সুলতানা হবে। সে সিংহাসনে বসবে। সে অশ্বের পিঠে চড়ে অসি হাতে যুদ্ধ করবে। বড় বড় যোদ্ধারা তার শক্তি দেখে মাথা নত করে বশ্যতা স্বীকার করবে। অবাক হয়ে তারা ভাববে, খোদা এই নারীকে কি ধাতুতে তৈরী করে পাঠিয়েছেন! সে পুরুষ নয়। সামান্য একজন কোমলা নারী। যাকে একটা ধমক দিলে সে কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে; সেই কোমলা নারী পুরুষের চেয়েও ভয়ঙ্কর কঠিন হয়ে রাজ্যপরিচালনা করছে। পরাজিত রাজ্যকে নিজের মুঠোর মধ্যে রেখে বশীভূত করে রাখছে।

রিজিয়া এতদিন ধরে যে সঙ্কল্প করেছিল, সে সঙ্কল্প তার আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। আজ সে সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি। বড় বড় রাজন্যবর্গরা আজ তার বশীভূত। তারা বিস্মিত—রিজিয়ার রাজ্যপরিচালনা দেখে। রিজিয়া রমণী-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। রমণী যে ভীরু, রমণী যে কোমলা, রমণী যে ক্ষীণাঙ্গী, দুর্নাম ঘুচিয়ে অসিহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রমাণ করে দিয়েছে সে রমণী হলেও, রমণীর দুর্নামের বাইরে তার বিচরণ।

কিন্তু বিদেশী মুসাফের ইয়াকুত এসেই তার সব প্রতিজ্ঞা লয় করে দিল।

ইয়াকুতের ঐ বলিষ্ঠ বাহু দেখে তার রমণী-হৃদয়ের কামনা বাসনা জেগে উঠলো। সে পুরুষের বেশে রাজ্য পরিচালনা করে। কিন্তু পুরুষের বেশ শরীরে থাকলেও সে যে নারী—তার দেহের শোণিতে যে উষ্ণ রমণীরক্ত। তার দেহে যে যৌবনের সবকিছু উপাচার থরে থরে সাজানো—তাকে অস্বীকার করবে কেমন করে?

কিন্তু আজ এত পরে এল কেন? জীবনের প্রথমারম্ভে যখন যৌবনের উপকরণ থরে থরে দেহের উপর মহামূল্য রত্নরাজির মত জ্যোতিপ্রবাহ নিয়ে সজ্জিত হয়েছিল তখন এসেছিল ইস্কান্দার। কিন্তু ইস্কান্দার ভীরু। দুঃসাহসিক ছিল না। যদি দুঃসাহসিক হতো তাহলে রিজিয়ার যৌবনকে সে অপহরণ না করে এমনি ছেড়ে দিতো না। ইস্কান্দার জানতো সে মরবে। কিন্তু মরবার আগে যদি সে রিজিয়াকে নিঃশেষ করে দিয়ে যেতে পারতো তবে তার মরা সার্থক হতো।

আজ রিজিয়া তাই ভাবে: সেদিন ইস্কান্দার মেয়েমানুষের মত ভালবাসার গান শুনিয়েছিল। বলিষ্ঠ হাতে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। বলিষ্ঠ হাতে যদি সেদিন ছিনিয়ে নিত তাহলে কি আজকে রিজিয়ার জীবনে বর্তমানের ইতিহাস তৈরী হতো। হয়ত ইস্কান্দারের বলিষ্ঠতায় তার সর্বস্ব ইস্কান্দারের বাহুর মধ্যে বন্ধ হয়ে যেত। তারপর তারা পালিয়ে যেত দিল্লী থেকে বহুদূরে। রিজিয়ার সিংহাসনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হতো।

কিন্তু জীবনের সেই প্রারম্ভে ইস্কান্দার তাকে তেমন করে ভোগ করলো না। সে পিছলে যেতে কর্তব্য বলিষ্ঠতার রূপ নিলো। সে সিংহাসনের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করলো। যৌবনকে দেহের রূপেই পরিবর্তিত করলো। মনের প্রতিক্রিয়া হলো না। যৌবন দেহে এসে একসময় বিদায় নিয়ে গেল। রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে রিজিয়া বুঝতে পেরেছে, যৌবনের চলে যাওয়ার সময় এসেছে। বুকের যন্ত্রণাটা বড় প্রকট। কিন্তু উপায় নেই।

সহসা চমক। কর্তব্যে গম্ভীর, শাসনে কঠোর রিজিয়ার মনে হঠাৎ যেন কে এসে সেই যৌবনের বিদায়ের মুহূর্তে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। সে চমকে উঠলো হঠাৎ অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত উল্কার মত আলোর ধূমকেতু দেখে। পরমুহূর্তে তার মনে পড়লো সে নারী।

কিন্তু সে নারী হলেও সে সুলতানা। সমস্ত রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী সে। তার একটি অঙ্গুলি হেলানে শ' শ' লোকের প্রাণ সমর্পণ করতে হয়। সে যেমন নিজে অন্যায় করতে পারে না তেমনি কেউ অন্যায় করলে তার শাস্তি—মৃত্যু।

সেইজন্যে তাকেও অনেক কর্তব্য মেনে চলতে হয়। রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা কমাবার জন্যে বিয়ে-শাদী উৎসব বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য তার মধ্যে আরও একটি অর্থ ছিল। বিয়ে-শাদী বন্ধ করার অর্থ—রিজিয়ার ঈর্ষা। রমণীর রমণীয় মনের পরিচয় এখানে প্রকাশ হয়েছে। রিজিয়া নিজে কখনও শাদী করতে পারবে না বলে রাজ্যে বিয়ে-শাদী বন্ধ থাকবে এমনি একটি হুকুম যেন মনে মনে সে প্রচার করেছিল। এমন

কি রিজিয়ার এই উৎসব বন্ধ করার পিছনের যে গোপন অর্থ—সে অর্থ সবার চোখে ধরা পড়ে গেছে।

তবে কি রিজিয়া দিনের পর দিন বিকৃতমনা হয়ে উঠছিল? সে ভাবতে লাগলো শুধু বিয়ে-শাদী সে বন্ধ করে নি। নাচ, গান, হৈ-হল্লা। খুশীর যে কটা ইন্ধন আছে সব কটি রিজিয়া বন্ধ করে রাজ্যে ত্রাস আনতে চেয়েছিল। আজ দরবারে ইয়াকুত ও ইতিগীনকে পদগৌরবে ভূষিত করে সে সব হুকুম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। রাজ্যে নাচ, গান, হাসি, উৎসব অনাবিলভাবে আবার ফোয়ারা ছুটিয়েছে।

বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়েই সে শুনতে পাচ্ছে। প্রাসাদের বাইরে দিল্লীর বিভিন্ন সম্রান্তের বাড়ীতে গানের মহড়া বসেছে। হয়ত যৌবন-চঞ্চল কোন নর্তকী পায়ে ঘুঙুর বেঁধে চটুল চাউনি নিয়ে অনেকদিন পরে আসরে নেমে সুধীজনের বাহবা কুড়োচ্ছে। রাজ্যের চারিদিকে যেন আবার অনাবিল আনন্দের বন্যা ছুটেছে। সেরাজীসরাবের উচ্ছল স্রোত রিজিয়ার শাসিত রাজ্যের চারিদিকে আবার মায়া-মোহ দেহ বিস্তার করে অভিসার রচনা করেছে।

তবু রিজিয়া আজ খুশী হয়েছিল। খুশী হয়েছে এইজন্যে যে সে তার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এতদিন ধরে যে মারাত্মক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সমস্ত উৎসব, গান, বাজনা, মানুষের যে সব খুশীর ইন্ধন ছিল, সব বন্ধ করে দিয়েছিল। যে জন্যে দিয়েছিল আজ তার মুক্তি হয়েছে। রিজিয়া আজ নিজেও উৎসব চায়। রিজিয়া নিজেও খুশীর বন্যায় নিজে ভেসে যেতে চায়। আজ তার রমণীর রমণীয় মন সম্পূর্ণ। সে আর এখন সুলতানা নয়। সে এখন রমণী। একটি বলিষ্ঠ পুরুষের বাহুর সুনিবিড় আলিঙ্গন কামনা করে। তার হৃদয়ে এসেছে গান। তার হৃদয়ের তারের যন্ত্রে সুর বাজতে শুরু করেছে। সে সঙ্গীত-পিপাসু হয়ে উঠেছে। তার অন্তরে যেন ছন্দের একটি নিটোল ঘূর্ণী পাক খেয়ে খেয়ে তাকে নর্তকী করে তুলেছে।

•
• •

কিন্তু হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গলো নগর প্রদক্ষিণের সময় কয়েকজন নগরবাসীর উচ্চৈঃস্বরের আলাপন শুনে। তখনই তার মনে হয়েছিল ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঐ নগরবাসীর গাত্রবর্ণ চাবুকের আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে দেয়। এতদূর স্পর্ধা এই কুক্কুটদলের। তারা সমালোচনা করে উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি সুলতানা রিজিয়ার? যে রমণী হয়েও সহস্র পুরুষের মত শক্তি ধরে রাজ্য পরিচালনা করে, তার কাজের সমালোচনা করে এই বেতমিজ বেওকুফের দল।

নবনিযুক্ত অশ্বপাল জালাউদ্দীন ইয়াকুত পাশেই ছিল। ইয়াকুত তাকে তার বলিষ্ঠ দুই-বাহু দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে অশ্বের পৃষ্ঠে তুলে দিয়েছিল। ইয়াকুতের

হাতের স্পর্শে রিজিয়ার শরীরে শিহরণ জেগেছিল। স্বাভাবিক লজ্জায় তার মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়। আবার সহজ হতেও তার বেশী সময় লাগে নি।

রিজিয়া সুলতান-বাদশাহ্‌দের নিয়মটি মেনে নিয়েছিল। আগে অবশ্য অশ্বের পিঠে উঠতো একটি উঁচু প্লাটফর্মের ওপর উঠে। আর সাহায্য নিতো প্রধানা-বাঁদী ফিরোজার কিংবা অন্যান্য কোন বাঁদীর। পুরুষ কেউ তাকে স্পর্শ করতো না। অবশ্য এ কাজটি অশ্বপালের। অশ্বপালের কর্তব্য সুলতানকে অশ্বের পিঠে উঠিয়ে দিতে সাহায্য করা। কিন্তু রিজিয়া অশ্বপালের কোন সাহায্য নিতো না।

ইয়াকুতকে যখন সে অশ্বপাল নিযুক্ত করে তখন তার মনে পড়ে যায় অশ্বপালের কর্তব্যটি। মনে মনে সেই থেকেই রিজিয়া রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তারপর যখন রিজিয়া অশ্বপালকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দেয় তখন ইয়াকুত চমকে বারকয়েক ইতস্তত করে। কিন্তু সুলতানার হুকুম। তার অধীনস্থর পালন করা অবশ্য কর্তব্য। রিজিয়া মনে মনে হাসে তার গোপন অভিসন্ধির কথা ভেবে। ইয়াকুতকে যখনই তার ভাল লেগেছিল তখনই সে যে তাকে অশ্বপাল নিযুক্ত করেছিল এবং অশ্বপাল নিযুক্ত করার পরের ভূমিকা যে এইটি—এসব চিন্তা রিজিয়া অনেক আগেই করে রেখেছিল। ইয়াকুত তার বলিষ্ঠ হাতের বেষ্টনে তাকে জড়িয়ে ধরে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে দেবে। আর তার শরীরের স্পর্শে দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। অতৃপ্ত হৃদয়ে পুলক এসে কানায় কানায় ভরে দেবে। এসব চিন্তা সে অনেক আগেই করে রেখেছিল। তাই যখন সে আমীর-ওমরাহের সামনে ইয়াকুতের বেষ্টনে অশ্বের পিঠের ওপর উঠে বসলো তখন কোনদিকে একবারও সে তাকিয়ে দেখলো না। যেটুকু লজ্জা তাকে ঘিরে খেলা করলো, তারা খুব বেশী অনুগ্রহ না পেয়ে সরে গেল আস্তে আস্তে। রিজিয়া হৃদয়কে যথেষ্টভাবে সংযত করে অশ্বের বল্গা ধরে তাকে সামনের দিকে ছুটিয়ে দিলো। পাশে অশ্বপাল ইয়াকুত। পিছনে আরও কয়েকজন দেহরক্ষী।

রিজিয়া বুঝতে পারলো—আমীর-ওমরাহ, মন্ত্রী-সেনাপতি, রাজন্যবর্গরা সুলতানার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছে। হাঁ করে তারা রিজিয়ার নবতম আচরণটি তলিয়ে ভাববার চেষ্টা করছে। তারপর রিজিয়া একটু এগিয়ে গেলে হঠাৎ তার কানে গেল —আমীর-ওমরাহদের মধ্যে থেকে কে একজন বলছে—আরও কত দেখবে ছাখো। এই তো সবে শুরু।

অন্য একজন তার কথার জের টেনে বলল—শেষকালে একটা হাবসী এমনি সুন্দরীর কৃপা পেলো!

সবই খোদার ইচ্ছা। একেই বলে আল্লা যাকে দেন তাকে ছপ্পড় ভরে দেন।

কথাগুলো হয়ত খুব খারাপ নয়। কিন্তু রিজিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ইচ্ছে করলো অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে ছুটে যায় ঐ নিন্দুকদের কাছে। যারা তার সমালোচনায় সময় অপব্যয় করছে। তারা ভেবেছে কি? রিজিয়া রমণী বলে তার কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকবে না? সুলতান হলে তার হারেমে অজস্র বেগম এসে জুটতো।

আর সে রমণী বলে, সুলতানা বলে, সে নীরস জীবন যাপন করবে। তার ভাল লাগলে সে ভাল-লাগা নিয়ে মরমে মরে থাকবে।

এতদিন সে রাজ্যের জন্যে, রাজকার্যের জন্যে, সিংহাসনকে বিদ্রোহীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে কঠিন মনে কর্তব্য পালন করেছে। এতদিন পর তার রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছে। এখন যদি সে অন্যদিকে একটু মন দেয়। একটু যদি নিজে বিলাসী হয়ে ওঠে তার জন্য এরা সমালোচনা করবে কেন? সুলতান হলে বিলাসী হতো না! সুলতানা বলে বুঝি সে বিলাসিনী হতে পারে না! সুলতানা রমণী বলে বুঝি তার ইচ্ছার কোন মূল্য নেই!

অশ্বের পিঠে চড়ে যেতে যেতে মনের মধ্যে এইসব কথা রোমন্থন করে রিজিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো এইসব মুখোসধারী রাজপ্রতিনিধিদের সুযোগ পেলেই শায়েস্তা করতে হবে। কোনরকম ক্ষমা নেই।

তখনকার দিনে দিল্লীর নগরপথে রমণী সুলতানা রিজিয়া নগর প্রদক্ষিণ করতে বেরোলে নগরবাসীদের মধ্যে একটা কৌতূহলের সাড়া পড়ে যেত। কাতারে কাতারে নগরবাসী পথের ওপর দাঁড়িয়ে সুলতানা রিজিয়াকে দুচোখ ভরে দেখতো। তারা অবাক হয়ে ভাবতো—সামান্য একটি রমণী। রমণী অলঙ্কারের মত ঘরের সৌন্দর্যই বাড়ায়। তাদের আব্রু নষ্ট হলে রমণীর ইজ্জত থাকে না। তারা দেওয়ানা হয়ে যায়। সেই রমণী ঘরের বার হয়ে সহস্র পুরুষের চোখের সামনে নিজেকে মেলে দিয়ে সিংহাসনে বসে রাজকার্য করছে। একটু কেন—বেশ অবাক লাগে বৈকী! সেইজন্যে তারা দেখতো দুচোখ ভরে।

কিন্তু এদিন দেখে রিজিয়ার অবাক লাগলো—আজ পথে অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী লোক। নগরের ঘরবাড়ীর জানলা-দরজার কপাটের ফাঁক দিয়ে রমণীরা উৎসুক নয়নে রিজিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। রিজিয়া বুঝতে পারলো—ওদের কৌতূহলের কারণ কি? এর মধ্যে যে সংবাদটা রাজদরবার থেকে নগরে নগরে রঙীন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—এই লোক সমাগমই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পাশে ইয়াকুত। বিরাট চেহারা। ছ'ফুট লম্বা, পঞ্চান্ন ইঞ্চি ছাতি। অশ্বপালের বিরাট চেহারা ও তার সঙ্গে পোষাকের জাঁকজমক—মানিয়েছে বড় চমৎকার। আর রিজিয়ার পরণে পুরুষের বেশ। মাথায় টুপী, গায়ে কোর্তা, কটিতে তরবারি। এই বেশে রিজিয়া প্রত্যহ নগরে ঘুরে বেড়ায়। এদিনও এসেছিল এই বেশে। ইচ্ছে ছিল রমণীর পরিচ্ছদেই ইয়াকুতের পাশে পাশে চলে। কিন্তু রমণীর পরিচ্ছদে ঘোড়ায় চড়া অসুবিধে বলেই ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। অশ্বের পিঠে চড়ে দিল্লীর প্রথম সুলতানা রিজিয়া সম্মানে বক্ষ দৃঢ় করে সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে সম্মুখদিকে। অগণিত নগরবাসী রিজিয়ার দিকে কুর্নিশ করে মাথা নত করে।

রিজিয়ার মুখে মৃদু হাসি। সে প্রশান্ত মুখে নগরবাসীর কুর্নিশ গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। মাঝে মাঝে রিজিয়া মৃদুস্বরে পাশে চলমান

ইয়াকুতকে বুঝিয়ে দিচ্ছে নগরের বিভিন্ন স্থান। ইয়াকুত পদমর্যাদার গাম্ভীর্য নিয়ে মাথা নেড়ে সুলতানার সম্মান রক্ষা করছে।

হঠাৎ এক জায়গায় একটি জটলা। কয়েকটি নগরবাসী আলাপনে ব্যস্ত। তারা এত জোরে তর্ক বিতর্ক করছিল যে তাদের সোচ্চার কণ্ঠস্বর শুনে রিজিয়াকে একস্থানে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আছে। সুলতানা রিজিয়া রাত কাটায় একা তার মহলে! বাপ, দাদারা বেগম-মহল, বাঁদীমহল নিঃশেষ করে গেল—আর সাধু মেয়ে এসেছে সুলতানা রিজিয়া।

এই যে ঐ হাবশী লোকটা। যার গুণ্ডার মত চেহারা তাই দেখে রিজিয়ার ভাল লাগলো। আসল কথাটা বুঝতে পারলে না হে—সুলতানা একটু শক্তিমান লোকের সঙ্গে মহব্বত করতে পছন্দ করে। শক্তিমান লোক এসে তাকে পিষে ধরলে শক্তিময়ী সুলতানার উষ্ণরক্তের কামনা নির্বাপিত হয়।

তারপর লোকগুলো হো হো করে পাগলের মত হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো—সুলতানা আমাদের চেয়ে ধড়িবাজ চালাক। দেখলে না সেই হাবশী-গুণ্ডাটাকে তার ভাল লাগলো অমনি রাজ্য থেকে উৎসবের পরোয়ানা তুলে নিয়ে নিজে উৎসবে লেগে পড়লো। এবার দেখবে 'খুসকৃফিরোজী' প্রাসাদের রাতের চোখে ঘুম আসবে না। আবার তারা হো হো করে হেসে উঠলো।



রিজিয়া মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল প্রাসাদে। তারপর উজীরপ্রবর খাজা মুহজুব্‌কে ডেকে আদেশ দিলো—খুসকৃফিরোজী প্রাসাদের চারিদিক আলোর মালায় ভরিয়ে দিন। জায়গায় জায়গায় গোলাপ জলের ফোয়ারা বসিয়ে সুগন্ধে চারিদিক আমোদ করিয়ে দিন। আতরদানে আতর দিন। রক্তরাগ ভেলভেটে চারিদিক মুড়ে দিন। নর্তকীমহল থেকে শ্রেষ্ঠ নর্তকী নিয়ে এসে প্রাসাদের প্রাঙ্গণে নাচের আয়োজন করে দিন। প্রচুর সুগন্ধী সেরাজীসরাব পাঠিয়ে দিয়ে আমার সুলতানা মর্যাদাকে সেলাম জানান।

উজীরপ্রবর খাজা মুহজুব সেলাম জানিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলো সেই সব আয়োজন করতে। কিছুক্ষণের মধ্যে আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ইতিগীন রিজিয়ার প্রাসাদে এসে এই সব আয়োজন দেখে খুশী হয়ে উঠলো। রিজিয়াকে সেলাম জানিয়ে বললো—বহুৎ মেহেরবাণী সুলতানা বিবি। আজ বুঝতে পাচ্ছি সুলতানার ভি দিল মজুত আছে।

রিজিয়া মৃদুহেসে ইতিগীনকে সমর্থন করে মাথা নাড়লো। তার মনে তখনও জ্বলছিল নগরবাসীর সেই বিশ্রী-ইঙ্গিতপূর্ণ কথাগুলি। একজন সুলতানা। হোক সে রমণী। তবু সে একচ্ছত্র অধিপতি এই সমগ্র রাজ্যের। তার হাতে রাজদণ্ড থাকা সত্ত্বেও কেউ তাকে ভয় করে না? নগরবাসীরা যা খুশী তাই তার নামে চিন্তা করে রাজ্যে রটনা করে। আর তাই তারা বিশ্বাস করে। সে বেশ্যার মত সবার কাছে হেয়। তার কোন সম্মান নেই।

সেদিন খুসক্ফিরোজী প্রাসাদে তাই রাতের অন্ধকারকে গলা টিপে হাজারো বাতির রোশনাই জ্বলে উঠলো। রাজ্যের প্রধানা নর্তকী আসরে এসে মিঠে কণ্ঠে গানের সাথে পায়ের মৃদুল-ছন্দে নাচের ঢেউ বইয়ে দিলো। রিজিয়া আসরে বসে সেরাজী সবাবের গেলাস মুখে তুলে আসরফির থলিয়া ছুঁড়ে দিল নর্তকীর দিকে। সেরাজী নেশায় বুঁদ হয়ে চীৎকার করে 'বাহবা' দিল। ইতিগীন আরও উত্তাল নাচের জন্য সেরা সেরা নর্তকী আসরে নিয়ে এসে হাজির করলো।

খুসক্ফিরোজী প্রাসাদের বৈধব্য ঘুচে গিয়ে পাথরে পাথরে যৌবনের উল্লাস জেগে উঠলো। হাজারো বাতির আলোর রোশনাই কেঁপে কেঁপে সুলতানাকে নেশা মদির চোখে নর্তকীর ঘাঘরার ভেতর দিয়ে তার সুন্দর পায়ের কেরামতি দেখতে থাকলো। কাঁচুলি ভেদ করে তার নবপ্রস্ফুটিত সমুদ্র উত্তাল বক্ষের নির্লজ্জ দোলানি .দখতে দেখতে হঠাৎ রিজিয়ার স্বাভাবিক চেতনা চীৎকার করে উঠলো—থামো।

ঘৃণায় রিজিয়ার নিজের রমণী হৃদয়ের অভ্যন্তরে যেন লজ্জার মেদুর স্পর্শ লাগলো। ছিঃ ছিঃ সে কি ভুলে গেল নাকি? সে কি তার ভাইয়ের মত বিকৃত মস্তিষ্ক, উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসী হয়ে উঠলো? মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক যে ভাইরা। যাদের মানুষেরা ঘৃণার চোখে দেখে। যাদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পিতা আলতামাস রিজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী করতে চেয়েছেন। শেষপর্যন্ত কতকগুলি সামান্য নগরবাসীর ওপর অভিমান করে সে নিজের স্বাভাবিক চেতনাকে বধ করতে বসেছে?

রিজিয়া নাচের আসর তুলে দিয়ে খুসক্ফিরোজী প্রাসাদ থেকে সমস্ত বিলাসী আয়োজন সরিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়ালো তার সেই নির্দিষ্ট বাতায়নের সামনে।

হঠাৎ তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতে লাগলো। ছুটে গেল ঘরে। টেবিলের ওপর রাখা বর্তিকার সামনে বসে সে কোরাণ খুলে চীৎকার করে পড়তে লাগলো—"ইয়ে খোদা আমার হৃদয়ের এ অশান্তি তোমার স্পর্শ দিয়ে শান্ত করে দাও।"

অনেকক্ষণ ধরে চীৎকার করে কোরাণের ধর্মকথা মনের মধ্যে ধরে হৃদয় পবিত্র ও শুদ্ধ করে তুললো। তারপর আবার বাতায়নের কাছে এসে উন্মুক্ত নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে ব্যাকুল দুটি চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইলো।

ফিরোজা কয়েকবার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সুলতানার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো। রিজিয়া বুঝলো, ফিরোজা কি বলতে চায়? কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়ে ফিরোজার সঙ্গে কথা বলতে তার ইচ্ছা করলো না। কথা বললে যে মনের অনেক

চেহারা ধরা পড়ে যায়। ধরা পড়ে গেলে ফিরোজা কিছু ভাববে বলে সে চুপ করে থাকলো। ফিরোজা যে রাতের আহারের জন্য বলতে এসেছিল সে কথা বুঝলো রিজিয়া। কিন্তু আহার তার আজকে আর করতে ইচ্ছা নেই। ফিরোজা শুনলে বলতো—কেন নেই? আবার কৈফিয়ৎ দেওয়া। আবার অনেক কথা। কিন্তু কিছুই যে আজ তার বলার নেই।

তখন বোধ হয় অনেক রাত। রজনী তখন কোন্ প্রহরে রিজিয়া জানে না। হঠাৎ তার কানে পৌছলো, প্রাসাদের নহবত চূড়ায় রাত্রি প্রহরের বার্তা ঘোষণা করছে। কিন্তু কত যে সে প্রহর জানবার আগেই ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে গেল রাতের নিস্তব্ধতায়।

আবার একসময় তন্ময়তার ঘোর কাটলো রিজিয়ার। সেই ফকির করুণার্দ্র স্বরে বিনিয়ে বিনিয়ে গান গাইছে। তার গানের কথাগুলি কান্নায় ভেজা। ভোরের শিশিরসিক্ত তৃণখণ্ডের মতো তার কান্নায় ভেজা গানের পরশে হৃদয় কেঁপে কেঁপে ওঠে।

বিরহী বিরহের জালায় নিশিদিন ধরে হৃদয়ের কান্নাকে রাতের নিবিড় অন্ধকারে দূর থেকে সুদূরে যেখানে প্রিয়াকে হারিয়েছে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যেন রাতের আকাশের বৃন্তে ফুলটি সবে ফুটে উঠেছে। বিরহীর গানে বৃন্তচ্যুত হয়ে ফুলটি মাটিতে ঝরে পড়ে অবহেলায় নিজের দেহকে ছিন্নবিছিন্ন করছে।

রিজিয়া 'পিথোরা' প্রাসাদের পাশে বিরাট সৌধ কুতুবমীনারের দিকে তাকিয়ে রইলো। অন্ধকারে কুতুবমীনারের সৌধকে যেন দীর্ঘদেহ পূর্বপুরুষ সুলতান কুতুবউদ্দীনের মত দেখাচ্ছে। তবে কি পূর্বপুরুষ সুলতান বুঝতে পারছে তার এই হৃদয়ের জ্বালা? সে যে এই রাতের নিস্তব্ধ প্রহরে নির্ঘুম দুটি চোখ নিয়ে বাতায়নে একা দাঁড়িয়ে আছে কিসের জন্যে?

মার কাছে গল্প শুনেছে রিজিয়া—চৌহানবংশীয় তৃতীয় পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীঢ়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই পৃথ্বীরাজ কনৌজ ও বারাণসীর সিংহাসনে গহরবাড়বংশীয় রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা অপরূপ সুন্দরী সংযুক্তাকে অপহরণ করে নিয়ে এসে বিবাহ করেন। তখনকার দিনে সমগ্র হিন্দুস্তানে পৃথ্বীরাজের মত এত বড় বীর কেউ ছিল না।

সেই পৃথ্বীরাজই দিল্লীর দক্ষিণে যমুনাতীরে 'রায় পিথোরা' (পৃথ্বীরাজ) নামে এই প্রাসাদ তৈরী করেন ও সংযুক্তার প্রেমকে চিরঅক্ষয় করে রাখবার জন্যে কুতুব-মীনার বলে যে সৌধ আজও বর্তমান আছে সেই সৌধের খানিক অংশ তৈরী করেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ বীর শিহাবুদ্দীন মহম্মদ গজনীও কাবুলের অধিকার স্থাপন করে 'তরাইন'-এর যুদ্ধে দিল্লী ও আজমীঢ়ের সিংহাসন পৃথ্বীরাজকে নিহত করে অধিকার করেন।

তারপরই কুতুবউদ্দীন শিহাবুদ্দীনকে পরাজিত করে দিল্লীসাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই কুতুবই পৃথ্বীরাজের সংযুক্তা-স্মৃতিসৌধ বিলুপ্ত করে 'কুতুব-মীনার' বা 'জাম-ই

মসজিদ' তৈরী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমাপ্ত হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। শেষে আলতামাস সিংহাসনে বসে অর্ধসমাপ্ত সৌধ সমাপ্ত করে 'কুতুব-মীনার' নাম অক্ষয় করে দেন।

পৃথ্বীরাজের প্রেয়সী সংযুক্তার প্রেমের স্মৃতি আর জগতে চির অক্ষয় হয়ে থাকলো না। কিন্তু রিজিয়া মায়ের কাছে যে গল্প শুনেছিল সে গল্প আজও ভোলেনি।



সংযুক্তা জগতে চির অমর। ইতিহাসে সত্য। অজেয় বীর হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ বীর পৃথ্বীরাজকে ভালবেসে সংযুক্তা পিতৃগৃহ ত্যাগ করতেও বাধ্য হয়েছিল। সে প্রেমকেই প্রাধান্য দিয়েছিল বেশী। বীরকে পূজা করে পিতাকে ভুলতেও সে পিছিয়ে যায়নি। পিতা কনৌজ ও বারাণসীর সিংহাসনে গহরবাড়বংশীয় রাজা জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে ধ্বংস করতেও এতটুকু দ্বিধা করেনি। কন্যার জীবনে বৈধব্য আনবার জন্যে তিনি মুসলমান সুলতানের সাহায্য নিয়েছিলেন!

সংযুক্তা তবু ভীত হয়ে পড়েনি। অনুরোধ করেনি পিতাকে। যুদ্ধসাজ নিজে হাতে পরিয়ে দিয়ে স্বামীকে পাঠিয়েছে যুদ্ধে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'তরাইনের' শ্রেষ্ঠ যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হয়ে মহম্মদ ঘোরীর বন্দী হয়।

সংযুক্তা সেদিন একাকী মুসলমান সুলতানের অধীনা না হয়ে যুদ্ধ করেছিল। সেই হিন্দু রমণীর যুদ্ধকৌশল দেখে মুসলমান সুলতান মহম্মদ ঘোরী বিস্মিত হয়েছিলেন। সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজ মুসলমানের হাতেই প্রাণ দিয়েছিল বটে; কিন্তু বীরের মত। দুই বীর পুরুষ ও রমণী শৌর্যের বীর্যের পরিচয় দিয়ে জগতে তাদের প্রেমের নিদর্শন রেখে গেছে। 'সংযুক্তা-পৃথ্বীরাজ উপাখ্যান' সবার মুখে শোনা যায়। তাদের সে প্রেম এই দিল্লীর আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলে প্রতি মানুষের মধ্যেই প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করে। কিন্তু মুসলমান সুলতানরা প্রেম কাকে বলে—মহব্বত কাকে বলে জানে না। তারা রমণীর দেহ ভোগ করে ভাবে এই বুঝি প্রেমের আসল স্বরূপ। সে নিশ্চয় দারুণ প্রেমিক। কিন্তু তারা জানে না—দিলের মধ্যে যে গুঞ্জরণ ওঠে, কলিজার মধ্যে যে ধুকপুক সৃষ্টি হয়, চোখে যে আঁধি লাগে—তার অর্থ কি?

কুতুব-মীনারের দিকে তাকিয়ে সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের উদ্দেশ্যে রিজিয়া কুর্নিশ করলো। মনে মনে বললো—'আমার হৃদয়ে তোমরা একটু শান্তি এনে দাও।'

ফকির সাহেব গান গাইছে। মীনা মসজিদের প্রাঙ্গণে বসে আল্লাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকছে। দরবারী রাগে ফকির আল্লাকে ইনিয়ে বিনিয়ে গানের সুরে আকুল হয়ে ডাকছে। কোরাণ-শরিফের অমৃতময় বাণী ফকিরের কণ্ঠ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে,

রাতের নিস্তব্ধ ধরিত্রীকে ব্যাকুল করে তুলছে। রিজিয়া কাঁদছে। তার সুন্দর চোখ দুটির কোল বেয়ে অশ্রুধারা ডালিম-রাঙা মসৃণ গালের ওপর দিয়ে গণ্ডে নেমে যাচ্ছে। কি অসহনীয় জ্বালা। আগুনের দীপ্তি চোখের তারায়। মনের মধ্যে একবার জাগছে বীরের শক্তি। সিংহাসন অরক্ষিত রাখবার জন্যে শত্রু নিধনের বল। আবার পরক্ষণে মনে হচ্ছে—যাক্, যাক্, সব যাক্। সে চায় না কিছু। সে হারিয়ে যেতে চায়। সে ভালবাসতে চায়। সে মহব্বতের রঙে রাঙা হয়ে উঠতে চায়। এতদিন ধরে যে জীবনকে সে বধ করে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যায় করেছিল; তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

সে প্রায়শ্চিত্ত করবে। দিল্লী থেকে অনেকদূর চলে গিয়ে পৃথিবীর কোন এক গোপন কোণে সে লুকিয়ে থাকবে। অন্ততঃ লোকে জানবে তুর্কী রমণী রিজিয়া হৃদয়কে ঠকাতে না পেরে দূরে পালিয়ে গেছে।

পঁচিশটি বসন্ত তার জীবনে এসেছে। পঁচিশটি বসন্তকে সে বিদায় দিয়েছে অন্যায় ভাবে। সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবে বাকী জীবনের খেসারৎ দিয়ে। সেও ঐ ফকিরের মত কোন মসজিদের প্রাঙ্গণে বসে রাতের পর রাত প্রিয়জনের জন্য আকুল হয়ে কাঁদবে। পৃথিবীর কাছে তার অনেক অভিযোগ। সে পৃথিবীকে অপরাধী করবে। রমণী করে যখন পৃথিবীতে তাকে পাঠিয়েছেন আল্লা। তবে রমণীর আসল ধর্ম তাকে পালন করতে কেন দেবেন না?

রিজিয়া যেন ভাবতে ভাবতে অপরূপ রূপে মহিয়সী হয়ে উঠলো। চোখের জল শুকোলো। প্রাণের জ্বালা কমলো। মাটিতে পড়ে যাওয়া ওড়নাটা বুকের ওপর তুলে নিয়ে মুখের প্রসন্নতা ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

নহবত চূড়ায় নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে আবার ঘণ্টাধ্বনি হলো। খোজা প্রহরীর পায়ের শব্দ ভেসে এল। ফকির সাহেব এখন আর দরবারী সুরে প্রাণ মন ব্যাকুল করে তুলছে না। এখন তার কণ্ঠে বেহাগের রাগ। ফকির সাহেব গাইছে বেহাগরাগে গজল।

'সদ্ বহার্ আখির্ শুদ্ ও হর্ গুল বফর্কে জা গেরেফৎ।
ঘুঞ্চা-এ-বাঘ্-ই-দিল্-ই-মা জেব্-ই দস্তারে নাশুদ্।'

সঙ্গীতের অপূর্ব মূর্ছনায় ভাবাবেগে রিজিয়ার চোখে ঘুম এসে গেল।

আরও একটি কথা ইতিহাসে লেখা হয়ে গেল। ইয়াকুত নিজের শয়ন-কক্ষে মখমলের বিছানার ওপর আদুল গায়ে শুয়ে শুয়ে চিন্তার গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিল। কক্ষের মধ্যে আলো-অন্ধকারের খেলা চলছিল। এক কোণে একটি অল্প আলোর বর্তিকা রাখা আছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে নতুন পদপ্রাপ্তির গর্বে গর্বিত ইয়াকুতের পেশীবহুল দেহ। যে দেহকে দেখে রিজিয়া প্রথম দর্শনে চমকে উঠেছিল।

কক্ষটি অদ্ভুত সুন্দর করে সাজানো। মনে হয় রিজিয়ার ভিন্ন আদেশে এ কক্ষের শোভা অধিকতর বর্ধিত হয়েছে। দিল্লীর প্রাসাদের অপরূপ ঝলমল ঐশ্বর্যের এক কণা বুঝি রিজিয়া তার প্রিয়তমের ঘর সাজাবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঘরে গোলাপের সুবাস।

চাঁদের আলো এসে পড়েছে পালঙ্কের ওপর। ইয়াকুতের মুখের ওপর। মৃদুমন্দ সুগন্ধি বাতাস ভেসে আসছে উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে। কারুকার্যখচিত বহুমূল্য মেহগনি কাঠের টেবিলের ওপর রক্তবর্ণের ভেলভেটের ঝালর ঢাকা দেওয়া। তার ওপর রাখা আছে স্বর্ণভৃঙ্গারপূর্ণ সেরাজী সরাব। ইয়াকুত হাবশী হলেও সে সরাব পান করে না পরিচারিকারা জানে, তবু রেখে গেছে যদি দরকার হয়।

ইয়াকুত ভাবছে। অখণ্ড ভাবনার সাগরে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। অপমানের তীব্র জ্বালায় মহীরুহের মত দেহ ছটফট করছে। শোণিতে প্রতিশোধের জ্বালা। রক্ত চাই। এ অপমানের উপযুক্ত শাস্তি অপমানকারীকে দিলে তবে প্রাণের শান্তি। সে যোদ্ধা, সে বীর। সে একা এক সহস্র তুর্কী সেনানীকে এক নিমেষে অসির ঘায়ে ধরাশায়ী করতে পারে।

অথচ নীরবে অগুণতি আমীর-ওমরাহের সামনে তাকে নীরবে সব লাঞ্ছনা, সব অত্যাচার সহ্য করতে হলো। ছোট ছোট রাজকর্মচারী পর্যন্ত তাকে কটূক্তি করলো। সে বুঝলো, রিজিয়ার যারা সুহৃদ, উপকারী বলে প্রকাশ করে—তারা তলে তলে কত বড় শয়তান। বিদ্রোহ করবার জন্যে, বিদ্রোহী হবার জন্যে তারা সবসময় তৈরী। সবসময় তারা একটি রমণীর বিরুদ্ধে গোপনে দল তৈরী করছে।

আজ রিজিয়া কত যে অসহায় তা একমাত্র ইয়াকুতই জানে। অথচ প্রথম রাজদরবারে আমীর-ওমরাহের সামনে সিংহাসনে উপবিষ্ট রিজিয়াকে দেখে তার মনে হয়েছিল—পৃথিবীতে এর মত বুঝি সৌভাগ্যশালিনী কেউ নেই। রিজিয়ার সৌভাগ্য দেখে তার ঈর্ষা হয়েছিল। কিন্তু সে যে কত বড ভুল। ভ্রান্ত। আজকের অবস্থা দেখলে বোঝা যায়। অসহায়া রিজিয়া। নিতান্তই অবলা এক নারী। তার পিছনে সমস্ত রাজ্য বিদ্রোহী। সিংহাসনের পাশে যারা বন্ধুর মত রাজকার্যের সাহায্যের জন্য আছে, তারা ওৎ পেতে আছে সংগ্রামের জন্য। রিজিয়া অন্যায় করলেই তাকে পদতলে দলিত করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। রমণীর রক্তে তুর্কীবীররা নিজেদের হাত রঞ্জিত করবে।

ইতিগীন। যাকে স্নেহ করে রিজিয়া রাজপ্রাসাদের পরিরক্ষক করেছে। সেই ইতিগীন। বেইমান। সে গোপনে গোপনে রিজিয়ার বিরুদ্ধে দল তৈরী করছে। রিজিয়ার বৈমাত্রেয় ভাই মুইজুদ্দিন বহরামের দলে গিয়ে ভিড়েছে। অবশ্য তার দলে যাওয়ারও অনেক উদ্দেশ্য আছে। বহরাম সর্বদা বহু রমণীকে নিয়ে উচ্ছল আনন্দস্রোতে অবগাহন করে। ইতিগীনের সেইজন্যে রমণী সাহচর্য খুব সুলভ হয়ে ওঠে। তার কবিতার রঙে রাঙা হয়ে যে সব প্রেয়সী তার বক্ষে এসে ধরা দেয় তাদের সাথে সেরাজী সরাব মেশালে ইতিগীনের পদমর্যাদার সম্মানমূল্য আরও ভারী হয়ে ওঠে।

ইতিগীন শুধু এই সামান্য শস্তা রমণী সাহচর্যে মন খুশী রাখতো না। বহরামের ভগ্নী আসমানের সাথে গোপনে মহব্বতের খেলা খেলতে শুরু করেছে। একথা খুবই গোপনে আছে। একমাত্র ইয়াকুত ছাড়া বোধহয় কেউ জানে না।

ইয়াকুত নিজের কানে শুনেছে। নিজের চোখে দেখেছে বলে সে বিশ্বাস করে। সেদিন সাঁঝের অন্ধকারে ইয়াকুত অশ্বশালা থেকে রাজপ্রাসাদের ভেতর পথ দিয়ে বাইরে আসছিল। হঠাৎ পাশের গলিপথ থেকে কার যেন চাপা কণ্ঠস্বর ইয়াকুতের কানে এসে পৌঁছলো। সে সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

রমণীকণ্ঠটি ইয়াকুত চিনতে পারলো। বহরামের দুলালী ভগ্নী আসমান। এই আসমান রিজিয়ার ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে সর্বদা রিজিয়ার চরিত্র নিয়ে নানান মন্তব্য করে। এবং এক এক সময় ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, একবার সিংহাসনের অধিকার পেলেই হয় তারপর ঐ কলঙ্কিনী মন্দা মেয়েলোকটাকে কি করে শাস্তি দিতে হয় তা সে দেখে নেবে। ঘাতকের কৃপাণ দিয়ে অঙ্গের এক একটি অংশ কেটে এক একদিন ফেলে রাখবে, তারপর যন্ত্রণাব মধ্যে তাকে তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। তবে সহজে মরতে দেবে না। মরতে দিলে মুক্তি পাবে। তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলে যন্ত্রণায় পাগল হয়ে উঠবে। সেই শাস্তি।

সেই আসমানের কণ্ঠস্বর শুনে ইয়াকুত নিজেকে একটু গোপন স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখলো। পুরুষ কণ্ঠস্বরটিও ইয়াকুত শুনতে পেল। কিন্তু শুনে সে অবাক হয়ে গেল—ইতিগীন। সেই প্রথম ইয়াকুত জানতে পারলো ইতিগীন আসলে ভাঁড় নয়, অত্যধিক ধূর্ত্ত চতুর একজন ভবিষ্যৎদর্শী যুবক। আসমানের সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে সে যে রিজিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে চায়—ইতিগীনের কার্যাবলী অনুসরণ করলেই তা বোঝা যায়।

এই ইতিগীনেব মনে মনে আশা ছিল সে রিজিয়ার কৃপাদৃষ্টি পাবে। সবাই যখন ইতিগীনেব সঙ্গে রিজিয়ার একটি কাল্পনিক সম্পর্ক গড়ে নিয়েছিল তখন ইতিগীন মনে মনে খুশী হয়েছিল। কিন্তু ইতিগীন জানতো না, রিজিয়া অত নরম হৃদয়ের মেয়ে নয়। বিজিয়া ইতিগীনকে স্নেহ কবতো বটে, কিন্তু সে স্নেহ যে প্রেমের রূপ নেবে, এ ধারণা মূর্খ ইতিগীনের মনে আনাই নিতান্ত বোকামী।

ইতিগীন অবশ্য সেদিনও রিজিয়ার শয়নকক্ষে অবারিতভাবে যাওয়া-আসা করতো। কিন্তু রিজিয়া কোনদিনও ইতিগীনকে দেখে কোন মন্দ ধারণা মনে পোষণ করেনি। তাই যখন অনেকে তার সঙ্গে ইতিগীনকে জড়িয়ে নানা কথা বলতো— রিজিয়া তখন বেদনাবোধ করতো।

ইয়াকুত আসার পরও দেখেছে ইতিগীনকে নিয়ে রিজিয়ার নামে রাজ্যের বহুলোক নানান খোসগল্প করে। এমন কি ইয়াকুতকে বলেছে—'মিয়া, শেষকালে উচ্ছিষ্ট যৌবনের নাগরজী হয়ে উঠলে?' ইয়াকুত সেদিন বোঝেনি কিন্তু আজ বুঝছে— ইতিগীন রিজিয়ার কতবড় সর্বনাশ করেছে। একটি সহজ, সরল মেয়ের কোমল মনে রেখাপাত করে সে বাইরে তার নামে নানান অশ্লীল কাহিনী প্রচার করেছে। ইতিগীন

যে কতবড় শয়তান, কতবড় বেইমান, রিজিয়া যদি জানতো। হয়তো সে জানে। এত বড় রাজ্য যে চালাচ্ছে সে কি এই সামান্য ষড়যন্ত্র ধরতে পারে না? ধরতে পারে। কিন্তু কোন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু ইয়াকুত রিজিয়ার এই খামখেয়ালীকে কিছুতে ক্ষমা করতে পারে না। একটি রমণীর বিরুদ্ধে তার ইজ্জত নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলা খেলবে—আর সেই রমণী তাই শুনে প্রতিবাদ করবে না, শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে শক্তি ব্যয় করে না ইয়াকুত তাকে ক্ষমা করতে পারে না। সেই ইতিগীন রাজরোষ থেকে নিজেকে কৌশলে বাঁচিয়ে অদ্ভুতভাবে নিজের কার্য সমাধা করে যাচ্ছে।

ইয়াকুত আসতেই ইতিগীনের অসুবিধা হয়েছে। আগে ইতিগীন প্রচার করতো সে রাত্রে রিজিয়ার খাসমহলে ছিল এবং রিজিয়া তার কুমারী মনের নিবিড় ছোঁয়াচ দিয়ে তার জীবন সার্থক করে দিয়েছে। কিন্তু ইয়াকুত আসতে, ও ইয়াকুতের সঙ্গে রিজিয়ার আসল সম্বন্ধ ধরা পড়তে ইতিগীনের চালাকি আর খাটলো না। রিজিয়াও ইতিগীনকে খুব আমল দিল না। খাসমহলে প্রবেশের পথ রিজিয়া বন্ধ করে দিল।

ইতিগীন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু করতে কিছু পারলো না। শুধু ইয়াকুতকে মৃদু হেসে বললো—দাদা, খুব সৌভাগ্যবান।

ইয়াকুত গলিপথের আর একটু কাছে সরে গেলো। ইতিগীন আসমানকে হয়ত বুকে জড়িয়ে ধরেছে, বোঝা গেল না। হয়ত বুকে জড়িয়ে ধরে অধরে অধর দিয়ে ইতিগীন রাজপরিবারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়। আসমানের প্রস্ফুটিত যৌবনের হরিণী দেহটি মনে মনে স্মরণ করলো ইয়াকুত। হাঁ, আসমানের রূপ আছে। রূপে আগুনের প্রদাহ আছে। ইতিগীন আসমানের সেই আগুনের দাহ সহ্য করতে পারবে। ইতিগীন চালাক পুরুষ। বয়স কম হলে কি হবে? রমণী সংসর্গে সে একজন যোদ্ধা। রমণী হৃদয় বশ করবার সব ক্ষমতা তার আছে।

বসরাই গোলাপের মত সৌন্দর্যকে আপন হৃদয়ে স্থাপন করে মোহাচ্ছন্ন না হয়ে আসল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ক্ষমতা তার আছে। ইতিগীনের গোপন উদ্দেশ্য যেন সেই মুহূর্তে ইয়াকুতের কাছে ধরা পড়ে গেল। ইতিগীন যে আসমানকে হাত করে রাজপরিবারকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে চায়। এমনি কি হয়ত মনে মনে নিজেকে দিল্লীর সিংহাসনের সুলতান করার স্বপ্ন দেখে। ইয়াকুতের ইচ্ছে করলো, এইমুহূর্তে তরবারী উন্মুক্ত করে দুটি দেহ থেকে মুণ্ড নামিয়ে দেয়। দুটি নরনারীর রক্তস্রোতে এই গতিপথ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অন্ততঃ লোকে জানবে রাজপরিবারের কন্যার গোপন অভিসারের শেষপরিণতি এইরকম ভাবে হয়েছে। কিন্তু তাতে রিজিয়ার বিপদ। বিদ্রোহের আগুন জ্বালতে শুধু এখন একটু সূচনার দরকার। সেই সূচনা যদি এত তাড়াতাড়ি হয়, তাহলে রিজিয়া দিশেহারা হয়ে যাবে। তার চেয়ে অপেক্ষা করে শত্রুগুলিকে চিনে নেওয়া ভাল। এই কথা ভেবে ইয়াকুত সেই গলিপথের গোপনস্থান থেকে বেরিয়ে চলে এল নিজের ঘরে।

কিন্তু প্রাণে তার শান্তি থাকলো না। রাজপরিবারের অভ্যন্তরের দৃশ্য সে যত দেখতে লাগলো আর তত সে চিন্তিত হয়ে পড়তে লাগলো রিজিয়ার কথা ভেবে। বেচারী।

তারপর হঠাৎ আজ সে অতর্কিতে বহরামের রঙমহলে প্রবেশ করে বসেছিল। এই প্রথম সে বহরামের রঙমহল দেখল।

দিল্লী-রাজপ্রাসাদের মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য পরিপূর্ণ কক্ষ আছে, এ কথা জালালউদ্দীন ইয়াকুত স্বপ্নেও ভাবে নি। সে শুধু অবাক হয়ে দীর্ঘ চোখ-দুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত রঙমহলের কারুকার্য দেখতে লাগলো। তার মনে হল, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য বুঝি এখানেই রাখা আছে। এত আলো যে—ভাল করে কিছুক্ষণ চোখ রাখা যায় না। ঘরের স্বর্ণালঙ্কারের ওপর, দর্পণের ওপর আলো পড়ে জ্যোতি বিকিরণ করছে। তারপর লাল, নীল, সবুজ, ফিরোজা, আসমানী কত রঙের যে বাহার তাহার ইয়ত্তা নাই। রঙমহলের রঙের বেসাতি যেন সর্বত্র। কক্ষের বাতাসে অদ্ভুত গন্ধের মিশ্রণ। হরেক রকমের পুষ্পস্তবক স্তম্ভে স্তম্ভে দোলায়মান। সেখানে মল্লিকা, মালতী, চামেলী, নাগকেশর, গন্ধরাজ ও গোলাপের ছড়াছড়ি। হীরকমণ্ডিত গুলাব-পাশ আতরদানের অভাব নেই। ইস্তাম্বুলের চিত্তোন্মাদকর সুগন্ধ। লোবানের তীব্র মধুর গন্ধ। তার ওপর অগুণতি বেহেস্তের হুরী। বক্ষের শোভাকে প্রায় উন্মুক্ত রেখে মৃত আলতামাসের তৃতীয় পুত্র বহরামকে ঘিরে বসে আছে। অপরূপ সুন্দরী একটি রমণীদেহ আসরে উত্তাল-নৃত্য করছে। যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে সেই রমণীটি প্রাণপণে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে।

আসরে বহু সম্ভ্রান্ত রাজপরিষদ। আমীর-ওমরাহরা সেরাজী সরাবের পাত্র মুখে তুলে উল্লাসে আনন্দ প্রকাশ করছে। তার মধ্যে ইতিগীনকেও দেখতে পেলো ইয়াকুত। ইতিগীন বহরামের পাশে বসে তাকে তোয়াজ করছে। মনে মনে ইয়াকুত ইতিগীনের প্রশংসা করলো। যুবকটি ঠিক জায়গায় নিজেকে ভেড়াতে পেরেছে—এবং বহরামের মোসাহেবী করলে যে তার অনেক কিছু সুবিধা হবে—সে তা জানে। আসমানকে আপন করে রাজপরিবারের একজন হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার সুবিধা হবে।

ইয়াকুত আরও দেখলো, রিজিয়ার সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বহরামের এই রঙমহলে এসে চিত্তবিনোদনের আনন্দে যোগদান করেছে। তারা এখন সব সেরাজী সরাবের নেশায় রঙীন হয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে নাচ দেখছে। পাশে বসে বসে সুন্দরীরা সেরাজী সরাবের পাত্র বিতরণ করছে আর আমীর-ওমরাহদের তোয়াজ করছে।

ইয়াকুত অবাক হয়ে গেল। রঙমহলে মেয়েগুলির ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা দেখে। রিজিয়ার রাজ্য পরিচালনায় রমণী দেহের এমনি অবমাননা হাবশীর প্রাণের মধ্যে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল। তার ইচ্ছে করলো, এই সরাবপ্যায়ী উন্মত্ত কুকুরগুলোর গলাগুলো তরবারী দিয়ে ছেদন করে মেয়েগুলোর ইজ্জত বাঁচায়। রিজিয়া কি জানে না তার ভায়ের এই উচ্ছৃঙ্খলতা? নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু উপায় নেই। আইনের রজ্জু দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করলে রাজ্যে বিদ্রোহ জাগবে।

আমীর-ওমরাহরা বিলাসী হতে চায়। রমণীদেহ ও সেরাজী-সরাব। এ দুটি সুলতানা নিজে রমণী হয়ে ব্যবহার করতে পারে না বলে তারা বহরামের সাথে মিশেছে। বহরামই যে একদিন সিংহাসনের আশা রাখে—এই চক্রান্ত দেখলে বোঝা যায়।

ইয়াকুত থামের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল বলে কক্ষের ব্যক্তিরা তাকে দেখতে পায় নি। থামের আড়ালে থেকে আলোর বন্যায় আসতে ইতিগীন উল্লাসে ছুটে এল।

ইয়া, আল্লা, কেয়া তাজ্জব ব্যাপার। দিল্লীসুলতানা বেগমসাহেবা রিজিয়ার পার্শ্বচর প্রিয়জন জালাউদ্দীন ইয়াকুত আজ মুইজুদ্দিন বহরামের রঙমহলে হাজির। বলেই সে উল্লাসে হা-হা করে হেসে উঠলো। তার কথা বলার ঢঙ্ ও হাসির কায়দা দেখে ইয়াকুতের গা জ্বালা করে উঠলো। কিন্তু কিছু সে বললো না। শুধু ইতিগীনকে সমর্থন করে একটু হাসলো।

ইতিগীন আবার তাকে আমন্ত্রণ জানালো: আরে চলিয়ে না। সেরাজী, খুবসুরৎ জেনানা সব তৈয়ের আছে।

নাচ থেমে গেছে। সকলে এইদিকে তাকিয়ে আছে। আমীরওমরাহরা বিরক্ত হয়ে ইয়াকুতকে দেখছে। সমস্ত আনন্দোৎসব স্তব্ধ। বহরাম ভ্রুকুটি করলেন। রমণীরা এতক্ষণ মোহগ্রস্ত হয়ে কেমন যেন পিচ্ছিল স্রোতে হারিয়ে গিয়েছিল। ইয়াকুত এই আসরে উপস্থিত হতে যেন বাঁধা সুরে ছেদ পরে বেসুরো হয়ে গেল। রমণীরা তাড়াতাড়ি নিজেদের ওড়নাটা বুকে তুলে দিয়ে সম্ভ্রম বজায় রাখলো।

বহরাম ক্ষিপ্ত হয়ে জড়িতস্বরে ইতিগীনকে আদেশ দিল—দোজাখের মেয়ের পেয়ারীকে ইধার লে আও।

ইতিগীন হাসছে। দারুণভাবে হাসছে। তার হাসিতে শব্দ নেই। কিন্তু তার চোখ দুটো হাসির ঢেউয়ে কেমন যেন আশ্চর্য লাগছে। ইতিগীনকে যেন কেমন লাগছে। কেমন যেন মনে হচ্ছে ও সব পারে। ইয়াকুত শক্তিহীন হয়ে পড়লো। খাপে পোরা তরবারী। কিন্তু সে তরবারীর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেল।

ইতিগীন কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললো—ভয় কি? বেগমসাহেবা কিছু জানতে পারবে না। তারপর হেসে বললো—লাহোর, গোয়ালিয়র, মালব প্রভৃতি রাজ্যের সবচেয়ে সেরা সুন্দরী। সেরা বাইজী। সেরা বাঁদী। উষ্ণরক্তের মোহিনী স্পর্শে মাতাল হয়ে গেলে সেরাজী সরাবকেও হার মানায়। এই বলে ইতিগীন এবার রঙমহলের সমস্ত দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে হা হা করে হেসে উঠলো।

হাসি প্রশমিত হলে হঠাৎ ইতিগীন দুঃসাহসিকভাবে ইয়াকুতের বলিষ্ঠ একটি হাত খপ্ করে ধরে ফেললো। ধরে টানতে টানতে একেবারে আসরের মাঝখানে নিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আসরের সম্ভ্রান্ত আমীর-ওমরাহরা সেরাজীর নেশায় ঢুলতে ঢুলতে খি-খি করে পাগলের মত হেসে উঠলো। নানারঙের ফুলগুলো হাসির ঢেউয়ে মৌ মৌ হয়ে হাত-পা মেলে চারিদিকে জড়াজড়ি করে জড়িয়ে গেল। স্বর্ণ-রজতময় দীপাবলীর উজ্জ্বল আলোকমালাগুলি ঝলমল শব্দ করে জলতরঙ্গের

শব্দ তুলে চারিদিকে যন্ত্রসঙ্গীতের তান সৃষ্টি করলো। ইয়াকুত আকস্মিক এই ধরণের অশোভনীয় ঘটনার মধ্যে পড়ে কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেল। ইতিগীন, নিম্নপদস্থ কর্মচারী হয়ে যে এমনি বেলাল্লাপনা করবে—সে স্বপ্নেও ভাবেনি। বুঝতে পারলো, এতখানি সাহস সে সঞ্চয় করেছে—কার কাছ থেকে? মুইজ্জুদ্দীন বহরাম যে ভিতরে ভিতরে ইতিগীনকে উত্তেজিত করছে বোঝা যায়। ইতিগীনের এত সাহস যে বহরামের প্ররোচনায় তাও বেশ অনুমান করা যায়।

হঠাৎ ইতিগীন আবার করলো কি? একটি সুন্দরী রমণীকে আসর থেকে হাত ধরে তুলে আলোতে মুখখানা মেলে দিয়ে ইয়াকুতকে দেখিয়ে বললো—দোস্ত, সুলতানা বেগমসাহেবার চেয়েও কি এ সুন্দর নয়? তুমি কি দেখে ভুললে বাপু? দেখো, ভাল করে চোখ মেলে চেয়ে দেখো। দিল্ ধড়ফড় করে কিনা—দেখোতো!

ইয়াকুতের একেবারে বুকের কাছে রমণীটি। রমণীটির উষ্ণ নিঃশ্বাস ইয়াকুতের চোখ-মুখের ওপর লাগছে। আগুনের তাপ লেগে পুড়ে যাচ্ছে। জ্বলে যাচ্ছে। মিষ্টি একটি গন্ধ। গন্ধটি রমণীটির গাত্রবর্ণ থেকে। সেরাজী সরাবের উৎকট গন্ধও একে হার মানায়। ইয়াকুত মেয়েটির চোখের দিকে তাকাতে গেল। কিন্তু উজ্জ্বল আলোতে শত চক্ষু তার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে গিলছে যে তাকে না তাকিয়ে মাথা নত করতে হলো।

হঠাৎ আমীর-ওমরাহরা খি-খি করে হেসে উঠে চীৎকার করে বললো—সুলতানার দিল্ বিগার যাবে। মজে যেও না ভাই!

ইতিগীন হঠাৎ আরও একটি কাণ্ড করলো। যে মেয়েটি ইয়াকুতের সামনে অপ্সরীর রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার ঘাঘরা কাঁচুলির বন্ধন ধরে টানতে লাগলো। মেয়েটি লজ্জায় রঙীন হয়ে খিলখিল করে হেসে নিজেকে আগলাতে লাগলো। হাসির ঢেউ উঠলো গমগমে আসরে। ইয়াকুতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। মরীয়া হয়ে আসরের মাঝপথে পশ্চাদ্ধাবন করে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হা-হা করে হাসির প্রতিধ্বনি ইয়াকুতের পিছন পিছন তাকে ধাওয়া করলো। তার সাথে সুন্দরী রমণীদের খিলখিল করে হাসি ওদের হাসির সাথে মিশে ইয়াকুতকে পাগল করে দিল। তার পরণে ছিল পদমর্যাদার পোষাক। পোষাকের গুরুভারে তার সমস্ত দেহটি ভারী। সেই ভারী দেহ নিয়ে প্রাসাদের অলিন্দ দিয়ে চলতে চলতে সে বার বার ঠোক্কর খেতে লাগলো। অপমানের তীব্র কষাঘাতে যন্ত্রণায় পাক খেতে খেতে ইয়াকুত ফিরে এল তার কক্ষে।

স্বল্পালোকিত ঘরের মধ্যে ডিভানে বসে তার চোখে জল এল। জল এল নিজের জন্য নয়। রিজিয়ার ব্যর্থ জীবনের জন্য অনেক চিন্তা করলো। দিল্লীর সুলতানার নিরুপায় অবস্থা দেখে তার ইচ্ছে করলো—রিজিয়াকে কণ্টকশূন্য করতে পারলে তার সবচেয়ে শান্তি আসতো। কিন্তু সে একা। একা ঐ সমগ্র দিল্লী সাম্রাজ্যের তুর্কী যোদ্ধাদের পরাজিত করা বড় কঠিন। এখানে ষড়যন্ত্র বাতাসের আগে আগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লাহোর ও গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা ভেতরে ভেতরে দিল্লীর রাজন্যবর্গদের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদান করছে।

রণথম্বোর দুর্গের হিন্দুরা আবার বিদ্রোহী হয়ে দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করতে চায়। আগামী যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে। রণথম্বোর দুর্গ তারা চায়। বহু মুসলমান তুর্কী সেনানীকে হিন্দুরা রণথম্বোর দুর্গের মধ্যে অবরোধ করে রেখেছে। রিজিয়া প্রধান সেনাপতি মালিক কুতুবউদ্দীন হুসনঘোরিকে সৈন্য-সমাবেশে পাঠাতে মনস্থ করেছে।

ইয়াকুত চেয়েছিল সেও হুসনঘোরির সঙ্গে রণথম্বোর দুর্গ আক্রমণ করতে যায়। রিজিয়ার শত্রুকে বধ করতে পারলে তার শান্তি। রিজিয়াকে তার অভিপ্রায়ের কথা জানাতে রিজিয়া মৃদুহেসে বললো—না। রণথম্বোর দুর্গ হুসনঘোরি একাই জয় করে আসতে পারবে। তুমি এখানেই থাকো। এখানেই তোমাকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

রিজিয়া আসল কথা খুলে বলে নি, কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছে, রিজিয়া বেশ ভালভাবেই জানে যে বাইরের বিদ্রোহের চেয়ে ভেতরের বিদ্রোহ সবচেয়ে বেশী। ষড়যন্ত্রের ধোঁযা কুণ্ডলি হয়ে পাক খেয়ে খেয়ে রাজপ্রাসাদের উজ্জ্বল অলিন্দের মধ্যে ঘোরালো হয়ে উঠছে। এরই জন্যে তার ইয়াকুতকে প্রয়োজন। ইয়াকুত কাছে থাকলে যে রিজিয়া একটু সাহস পায় তা বোঝা যায়। অসহায়া একটি স্ত্রীলোক সমস্ত দিল্লী সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিশ্বরী হয়ে সর্বদা ভয়ে শঙ্কিতচিত্তে বিদ্রোহের আগমনে কাঁপছে। রিজিয়ার প্রয়োজন আজ ইয়াকুতকে শুধু হৃদয়ের জন্য নয়। প্রয়োজন সমগ্র তুর্কীদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে তাকে বাঁচানো। নিজে তুর্কী রমণী হয়ে একজন হাবশীর কৃপাপ্রার্থী হতে চায়। এক হাবশীর কাছে তার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা উজাড় করে দিয়ে সে তার মুক্তি চায়।

যখন সে একমনে রিজিয়ার কথা ভাবছে। রিজিয়ার অসহায়া অবস্থা চিন্তা করে তার চোখে জল আসছে। সমগ্র দিল্লী সাম্রাজ্যের তুর্কী রাজন্যবর্গদের ষড়যন্ত্রের কথা চিন্তা করে সে ভীত হয়ে পড়ছে। তুর্কীরা ঈর্ষায় রিজিয়ার সঙ্গে তার সহবাসের নানান অশ্লীল কাহিনী তৈরী করে প্রচার করে নগরবাসীকে ক্ষিপ্ত করে তুলছে। রিজিয়ার সরল মনকে পাপের ক্লেদাক্ত কালিমালিপ্ত করে তারা ষড়যন্ত্রকে আরও পাকিয়ে তুলছে। এইসব কথা সে নিস্তব্ধ রাত্রে একা নিজের ঘরে পালঙ্কে শুয়ে ভাবছিল।

এরই মধ্যে বাঁদী এসে ঘরের টেবিলে রৌপ্যপাত্রে তার রাতের আহার্য বস্তু রেখে গেছে। ইয়াকুতের আজ আহার করার কোন ইচ্ছে নেই। সব যেন তার তিক্ত ও বিস্বাদময় মনে হচ্ছে। গলা দিয়ে আহার্যবস্তু যে আজ যাবে না—সে বুঝতে পারে। তাই সে আহার্যবস্তু স্পর্শ না করে রক্ষিত স্বর্ণপাত্রে ভর্তি জল সে পান করে নেয়। পিপাসার্ত কণ্ঠের মধ্যে যেন পানীয় প্রবেশ করতে বুকের ভেতরটা কতকটা শান্তি পায়।

সে এগিয়ে এসে তার নিজস্ব তরবারীটি খাপ থেকে খুলে নেয়। স্বল্পালোকিত আলোর সামনে তরবারীটি ঝল্‌সে ওঠে। তরবারীটি হাওয়ায় দুচারবার শত্রুর

উত্তেজে ঘোরায়। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলে: ইতিমীন! বেইমানের শাস্তি তাকে অবশ্যই পেতে হবে।

কিন্তু তার আস্ফালনই সার। একা সে কতটুকুই বা করতে পারে? এখন যদি সে একটি ভিন্ন সৈন্যদল তৈরী করতে পারতো! কয়েকজন বলশালী হাবশীকে নিয়ে সে নিজের দেশে দল তৈরী করেছিল। তাদের যদি আজ আনিয়ে নিতে পারতো—তাহলে তুর্কী সেনানীদের বিদ্রোহী হওয়ার শিক্ষা বেশ ভালভাবেই দিতে পারতো। কিন্তু তার কোন উপায় নেই। এখন সে রিজিয়াকে ছেড়ে গেলেই এসে দেখবে রিজিয়া আর ইহজগতে নেই। কিংবা দিল্লী কারাগারে বসে অপেক্ষা করছে প্রাণদণ্ডের জন্য। মনে মনে শিউরে উঠলো ইয়াকুত।

হঠাৎ সে তার ঘরে কালো একটি মূর্তি দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো—কে? কে তুমি? ইয়াকুতের হাতে তরবারী ছিল, সে সেই তরবারী নিয়ে কালো মূর্তিটির দিকে এগিয়ে গেল।

খিল খিল করে কে হেসে গড়িয়ে পড়লো। কালো বোরখাটা শরীর থেকে মুক্ত করে রিজিয়া হাসতে হাসতে বললো—ছ্যাৎ, আমি এই ভীতু কাপুরুষটাকে সাহসী ভেবে নিজের পার্শ্বচর করেছিলাম!

ইয়াকুত হতবাক। স্বল্পালোকিত আলো যেন সহস্র পাখনা মেলে দিল। রিজিয়া সেজেছে। রমণীর অঙ্গে রত্নালঙ্কার। হীরা, চুণি পান্নার উজ্জ্বলতা স্বল্প আলোময় কক্ষে সহস্র আলোর রূপ নিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। দিল্লীর সমস্ত রত্নভাণ্ডার বোধ হয় রিজিয়ার অঙ্গে। কি যে সুন্দর লাগছে দেখতে! রিজিয়া একে সুন্দরী। তার সৌন্দর্যের খ্যাতি সমগ্র উত্তর ভারতে। রিজিয়ার মত সৌন্দর্য তুর্কীরমণীদের মধ্যে বিরল। তার উপর রিজিয়া সেজেছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত স্বর্ণালঙ্কারে মোড়া। সেই অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্য রিজিয়ার রূপকে আরও বাড়িয়েছে। ইয়াকুত চোখ ফেরাতে পারলো না। কেমন যেন হতবাক হয়ে বিস্ময়ে দুটি চোখ বড় বড় করে রিজিয়াকে দেখতে লাগলো। রিজিয়া হাসছিল। চোখে মোহিনীরূপ সৃষ্টি করে রাতের রহস্য মেখে সে ইয়াকুতের দিকে তাকিয়েছিল। ইয়াকুত সভয়ে পিছিয়ে গেল।

রিজিয়া আরও দু'পা ইয়াকুতের দিকে এগিয়ে গেল। রিজিয়া হাসছে। তার গোলাপী নরম অধরে হাসির মোহিনী মায়া।

ইয়াকুত অস্ফুটস্বরে চীৎকার করে উঠলো—না, না তুমি যাও। তুমি সুলতানা। তোমার অনেক কাজ। তোমার এভাবে নষ্ট হওয়া উচিত নয়।

রিজিয়া হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, ভ্রূকুটি করে বললো—আমার বুঝি জীবন নেই।

ইয়াকুত কাঁপছে। উত্তেজনায় তার পেশীবহুল দীর্ঘ দেহ থর থর করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে সে ডিভানের ওপর বসে পড়লো। বোবা নিরর্থক চাউনি নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। ভাবতে লাগলো, এ কে? একি সেই দিল্লীর একচ্ছত্র অধিকারী সুলতানা রিজিয়া বেগম—না অন্য কেউ! মনে হচ্ছে এই রাতের চোখে বাঁদী মহল থেকে কোন এক নষ্টা বাঁদী বেরিয়ে এসে ইয়াকুতকে পুড়িয়ে মারতে চাইছে!

তবে এই বাঁদীর দেহ ভর্তি এত রত্নালঙ্কার কোথা থেকে এল ? দিল্লীর যে সুলতানা সেই রিজিয়া পরিধান করে—পুরুষের পোষাক। গায়ে 'কাবা' (কোর্তা), শিরে 'কুল্যা' (উচু টুপী), কোমরে কটিবন্ধ পরে অশ্ব বা গজপৃষ্ঠে চড়ে নগর ভ্রমণ করে—রাজদরবারে অপরাধীর শাস্তিবিধান করে। সে নিজেকে কোন সময় রমণীর মত ভাবতেও লজ্জা বোধ করে। সেই রিজিয়া যদি এই হয়, তাহলে এর একি পরিবর্তন !

এই নিস্তব্ধ প্রাসাদের একাংশে ইয়াকুতের ঘরে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রবেশ করা। তারপর দিল্লীর কোষাগারের প্রভূত ধনরত্নের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি আকর্ষণ কববার জন্যে দিল্লীশ্বরী আজ প্রাণভরে সেজে এসে তাকে প্রলুব্ধ করতে চায়। কেন ? কেন ? কেন ? তবে কি রিজিয়া যে রমণী সে কথা ভাল করে জানতে চায় বলেই —এই গভীররাত্রে এই বেশে সে এসেছে ?

কিন্তু রিজিয়া তো জানে সে তাকে ভালবাসে ? রিজিয়ার পাণি প্রার্থনা করেই সে এই প্রাসাদে প্রবেশাধিকার নিয়েছে। রিজিয়াকে সে আগেও চেয়েছে এখনও চায়। আগে চেয়েছিল, সামান্য শক্তি পরীক্ষার বশবর্তী হয়ে। সে যে বীর, সে যে শক্তিবলে সবকিছু অধিকার করতে পারে এইটে প্রমাণ করবার জন্যেই উন্মুক্ত রাজসভায় ঐ রকম নির্ভয়ে সুলতানার পাণি প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু আজ এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে বাস করে রিজিয়ার পাশে পাশে থেকে সে দেখেছে—রিজিয়া কত অসহায়া। তার সামনে, পিছনে শাণিত কৃপাণ নিয়ে তারই পারিষদবর্গরা ওৎ পেতে রয়েছে। একটু সুযোগ পেলেই ধড় থেকে নামিয়ে দেবে সুলতানার মুণ্ড। রিজিয়ার প্রকৃত অবস্থা দেখে ইয়াকুতের মনে ভালবাসার সঞ্চার হয়েছে। মমতার রং দিয়ে ভালবাসার ভিত্। সুতরাং সে ভালবাসা শুধু দৈহিক সুখের জন্য নয়। রিজিয়ার দেহ পেলে ইন্দ্রিয়ের সুখ হবে। না পেলে ব্যর্থ। এই সামান্যকে মনে পোষণ করে ইয়াকুতের ভালবাসার জন্ম হয়নি। রিজিয়ার চারিদিকে যে শত্রুরা জাল বিস্তার করে তাকে জালে আটকে ফেলবার আয়োজন করছে তা থেকে একমাত্র সুহৃদ হয়ে তাকে বাঁচাবার জন্যেই এখন ইয়াকুতের চিন্তা। যদি বাঁচাতে পারে তাহলে একদিন বুঝবে সে সত্যিই রিজিয়ার পাণি প্রার্থনার যোগ্য, নতুবা ঐ উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী আমীর-ওমরাহরা যেমনি রমণীদেহ নিয়ে খেলা করে সেও রিজিয়ার রমণীদেহ সাময়িক ভোগ করতে চায় বলেই তার শক্তিকে অপচয় করেছে।

সুগন্ধ সুবাসে ঘর আমোদিত। স্বল্পালোয় রত্নালঙ্কারের উজ্জ্বলতা সহস্র আলোর জ্যোতি বিকিরণ করে বেহেস্তের হুরীর মত অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে সুলতানা রিজিয়া দাঁড়িয়ে আছে—রিজিয়া নামে একটি খুবসুরত জেনানা রাতের নিশীথলোকে পুরুষকে ভোলাবার জন্যে অপরূপ বসনভূষণে নিজেকে মায়াবিনী করে অভিসারিকা হবার জন্যে প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে ইয়াকুতের ঘরে এসে ঢুকেছে। ইয়াকুত একটু আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো—রিজিয়ার সুরমা আঁকা চোখ দুটি মাটিতে ন্যস্ত করে রক্তাক্ত অধরকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কি যেন ভাবছে ? মাথায় ওড়না দিয়ে অল্প অবগুণ্ঠন টানা হয়েছে। যে চুল টেনে ওপর দিকে তুলে মাথায় 'কুল্যা' (উচু টুপী) দেয় সেই

চুল পরিপাটি করে বেঁধে নানা কারুকার্য করা হয়েছে। মুখখানি প্রসাধনে রাঙানো হয়েছে। রিজিয়ার প্রসাধনহীন মুখই ইয়াকুত এযাবৎ দেখেছে। কিন্তু প্রসাধনে রাঙানো মুখ দেখে তার দেহের রক্তে চাঞ্চল্য জাগলো। পরণে গাঢ় রক্তরঙের বহু মূল্যবান ভেলভেটের সালোয়ারের পাঞ্জাবী। রক্তের সঙ্গে যেন মনের বর্তমান রূপের মিল আছে। গলায়, হাতে, কানে, মাথায় বহুমূল্য অলঙ্কার। অলঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন রঙের উজ্জ্বল পাথরগুলি থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। পান্না, চুণি, হীরার উজ্জ্বলতায় রিজিয়ার সুকুমারী তনুদেহটি মোহিনীরূপ নিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

ইয়াকুত মনের মধ্যে কষ্ট অনুভব করে। সভয়ে বাইরের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে। তারপর বলে—কেন এলে বেগমসাহেবা? দিলের তাড়নাকে প্রশ্রয় দিয়ে দিল্লীর সুলতানার ইজ্জত ধূলোয় লুটিয়ে দিতে এলে কেন?

কেন এলাম? মুসাফের, তুমি জিজ্ঞেস করছো কেন এলাম? তুমি যে আমায় ভালবাসো।

কিন্তু সে মহব্বতকে সম্মান দিতে গিয়ে তুমি যে নিজের সম্মান লুটিয়ে দিলে।

ক্ষতি কি? সুলতানা হয়ে যা পাইনি, মহব্বতে তা পেয়েছি। নিজেকে জেনেছি। হৃদয়কে জেনেছি। তোমাকে জেনেছি। সমস্ত রাজ্যকে জেনেছি। আজ তাইতো আমার এই রূপ!

কিন্তু তুমি হয়ত জানো না, তোমার পিছনে পিছনে ছায়ার মত গুপ্তচর ফিরছে। তোমার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য দিল্লী সাম্রাজ্যের সকলের।

রিজিয়া মৃদু হেসে বললো—জানি। জানি বলেই আমি সমস্ত দিল্লী সাম্রাজ্যের প্রতিটি লোককে জানাতে চাই—রিজিয়া সুলতানা হলেও সে মানুষ। তার দেহের শোণিতে মানুষের রক্ত আছে। সে যোদ্ধার বেশে যুদ্ধ করবে। অসি হাতে বিদ্রোহ দমন করবে। কাজীর মত রাজদরবারে বসে অপরাধীর বিচার করবে। অপরাধীকে কঠোর দণ্ড দেবে। সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা করবে। ব্যস্ এই ছাড়া আর কোন প্রয়োজনে সুলতানার কোন অধিকার নেই। কারণ সুলতানা রমণী। রমণী হয়ে তুর্কী মুসলমানের চিরাচরিত প্রথা পর্দার আড়াল ঘুচিয়ে পুরুষের বেশে রাজদণ্ড হাতে করে সিংহাসনে বসেছে। রজিয়তের পারিষদগণ রমণীর এই অন্যায় স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় কিছুতে ক্ষমা করতে পারেনি।

হঠাৎ রিজিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠলো—তুমি কি ইয়া জানো না, আজ আমাকে এরা 'মর্দা জানানা', 'দোস্তাখের নষ্টা নারী' বলে অভিহিত করে? আমি নষ্টা! আমি যদি নষ্টা হই তাহলে দিল্লী নগরের গৃহস্থবধূরা কি? তুমি কি শোননি? এই সিংহাসনে বসে যে সব সুলতানরা রাজত্ব করে গেছে তাঁদের হারেমে কত বেগম ছিল, তবু তাঁরা পুরুষ। তাই তাঁদের চরিত্রের নিশান তুলে সারা রাজ্যের কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। আর আমি রমণী হয়ে যত দোষ করেছি। তবু আমি কোরা-আন্ শরিফ পড়ি। মনটাকে পবিত্র করে রাখবার জন্যে সর্বদা ব্যস্ত করে রাখি। গান, বাজনা, নাচ, মাদক দ্রব্যের কোনদিন আমি বশীভূত হয়নি—পাছে আমার মধ্যে

শৈথিল্য আসে। কিন্তু তার পরিণাম কি হয়েছে? আমার নামে যত কুৎসিৎ কাহিনী রচনা করে রাজন্যবর্গরা তাদের বিলাসের সময় খোসগল্পের আনন্দ পরিবেশন করে।

ইয়াকুত বললো—কিন্তু তুমি আমার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেছ?

হ্যাঁ করেছি। আমি তুর্কী রমণী। আমি বীরকে পূজা করি। বীরের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তাকে আমি ক্ষমা করেছি। তার জন্য যদি হৃদয়ের কোন দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে থাকে—তাকে আমি দোষ মনে করি না।

আমাকে তোমার শাস্তি দেওয়াই উচিত ছিল?

সমগ্র তুর্কী সাম্রাজ্যের লোককে যদি ক্ষমা করে থাকি তাহলে তুমিও ক্ষমার যোগ্য। সমগ্র তুর্কী-সমাজের প্রতিটি পুরুষ আমার দেহ কামনা করে সেরাজী পান করে—আমি জানি। যদি শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে তাদেরই আগে দেওয়া উচিত। তুমি তো নির্ভয়ে আমাকে কামনা করতে পেরেছিলে? তাই যখন তুমি উন্মুক্ত রাজদরবারে নির্ভয়ে সেই অমূল্যবাক্য উচ্চারণ করলে—সেই মুহূর্তে আমার চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা সব বুদবুদের মত মিলিয়ে গেল শূন্যে। আজ তুর্কীরমণী হয়ে তুর্কীদের ঘৃণা করে এক বিদেশী মুসাফেরকে বিশ্বাস করেছি। এতেই কি তুমি বোঝ না আজ আমার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। আমি আজ ভাগ্যবিধাতা হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে রাজদণ্ড হাতে বসে আছি। মৃত কবরের মৃত্তিকার উপর বেহেস্তের কল্পনা করে সেখানে সুরম্য গোলাপ বাগিচা তৈরী করেছি। এই সিংহাসনের জন্যই আমার সারাজীবন ধরে স্বপ্ন ছিল। হঠাৎ উত্তেজনাকে সংযত করবার জন্যে রিজিয়া চুপ করলো।

ইয়াকুত কি বলবে? বলবার তার কিছুই ছিল না। সে সব জানে। এই কিছুক্ষণ আগেই এইসব কথা ভাবছিল। কিন্তু এসব কথাগুলি সুলতানা রিজিয়ার মুখ থেকে শুনে সে আশ্চর্য হল। সুলতানা যে এত গভীর চিন্তা করে তার জন্য তার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। সে রিজিয়াকে এই গভীর রাত্রে তার ঘরে দেখে যেমনি আশ্চর্য হয়েছিল, রিজিয়ার কথাগুলি শুনে তেমনি আশ্চর্য হলো। রিজিয়া তাকে এমনি আন্তরিকভাবে কখনও এতকথা বলেনি। তার হৃদয়ের একাংশ সেদিন কারাগারে উদঘাটিত করেছিল কিন্তু তখন মনে হয়েছিল—সামান্য এক নারী। হয়ত ভালবাসার রং নিয়েই সে ঘোরে। যোগ্য ব্যক্তির অভাবে এতদিন হৃদয় দিতে পারেনি, তাকে যোগ্য ভেবে হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছে। কিন্তু আজ বুঝলো—সেদিনের সেই চিন্তাধারায় কত ভুল ছিল। এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সে ভেবেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। রিজিয়ার এইমুহূর্তে তার মনের যে রূপ উদঘাটিত করলো, অন্তরের যে ভাবনা সে আন্তরিকভাবে বলে গেল, তার মধ্যে একটি রমণীর দৃঢ় মনের পরিচয়ই পরিস্ফুট হলো। সুলতানার দৃঢ়তাই তার আসল রূপ। রমণী ও সুলতানার দুটি ভিন্ন সত্তা থাকলেও দুটি সত্তাই সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। রিজিয়া সুলতানা হয়েও শ্রেষ্ঠা। রমণী হয়েও শ্রেষ্ঠা। সেখানে তার মত এক নগণ্যকে সঁপে দেবার বাসনা সম্পূর্ণ আসমানে চাঁদ ধরার মত। অন্ততঃ তার বিবেক-বুদ্ধি যা বলে তাতে এই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হঠাৎ রিজিয়া তার অতীত রোমন্থন থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে ঘরের মেহগিনি টেবিলে রক্ষিত রৌপ্যপাত্রে আহার্য বস্তু দেখে ইয়াকুতের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে শুধালো—একি তুমি রাতের আহার্য গ্রহণ করনি ?

ইয়াকুত মাথা নাড়লো।

কেন ?

ভাল লাগে নি বলে।

ভাল না লাগার কারণ !

বীর শ্রেষ্ঠ অশ্বপাল জালাউদ্দীন ইয়াকুত ম্লান হেসে মাথা নামালো, তারপর মাথা তুলে ম্লান স্বরে বললো—আমার গোস্তাখি মাপ করো বেগম-সুলতানা।

তা নয় করলাম, কিন্তু কারণ কি।

আমি বলতে ভয় পাই।

রিজিয়া অসন্তুষ্ট হলো। হয়ে ইয়াকুতের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললো—ভয় পাওয়ার কোন হেতু আছে ? তুমি আমার পার্শ্বচর। আমার চোখে যা পড়ে না, তুমি আমাকে সাহায্য করবে বলেই তোমাকে ঐ পদ দিয়েছি।

ইয়াকুত আর দ্বিধা না করে বহরামের রঙমহলের আদোপান্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে রিজিয়ার কাছে বলে গেল।

রিজিয়া শুনে কিছুক্ষণ বেদনাহত হয়ে চুপ করে রইলো। তারপর নিজেকে সহজ করে বললো—কিন্তু আমি তো ইতিগীনকে কিছু বলতে পারি না ইয়া। তোমাকে অপমান করার শাস্তি আমাকেই পেতে হবে। আমিই একদিন ইতিগীনকে প্রশয় দিয়ে তাকে এই প্রাসাদে প্রবেশাধিকার দিয়েছি। আজ সে আমার আত্মীয় হতে চলেছে। এখন আমার বহিন আসমানের সঙ্গে তার শাদী হবে। এখন সে আসমানের সম্পত্তি। এ রাজ্যের একজন বিশেষ ব্যক্তি।

রিজিয়া তারপর আবার বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো—কিন্তু তুমি কি তাই জন্যে আহার্যবস্তু গ্রহণ করনি ?

ইয়াকুত মাথা নাড়লো। তারপর বললো—ওরা সত্যি আমাকে অপমান করে নি, করেছে তোমাকে। তোমাকে অপমান করার জন্য আমার কলিজায় আগুন জ্বলেছে। তোমার অনিষ্ট হবে বলেই আমি কোনরূপ বিপর্যয় ঘটায় নি। না'হলে ঐ ইতিগীনের শোণিতে রঙমহলের রোশনাইয়ের শোভা বাড়িয়ে দিতাম। তার ছিন্নমুণ্ড তোমার বহিনকে উপহার দিয়ে বলতাম—ধন্য তুমি তুর্কীরমণী !

ইয়াকুতের বীরত্বপূর্ণ কথায় রিজিয়া মৃদু হাসলো, হেসে বললো—কিন্তু এসব করলে যে সুলতানাকেই বিপদে ফেলতে দোস্ত। তখন যে বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হতো।

ইয়াকুত হঠাৎ সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললো—তার জন্যে বিদেশী কথনও ভয় পায় না সুলতানা। তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার সুখ আছে একি সুলতানাকে নতুন করে শেখাতে হবে ?

রিজিয়া আহত হয়ে চুপ করে গেল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিম্নস্বরে বললো—তুমি আমার কৌতুক বুঝতে পার নি তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করো ইয়া। আমি তোমার বীরত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই নি। ইত্তিগীনকে আমি নিশ্চয় শাস্তি দিতাম কিন্তু আজ নিরুপায়। সে এখন বহিন আসমানের বাগদত্ত। তুমি জানো, এই সিংহাসন নিয়ে আমার ভাইদের সঙ্গে আমার কি রকম বিবাদ? রিজিয়া হঠাৎ রমণীসুলভ খিল খিল করে হেসে বললো—এখন এসব কথা থাক্। আর ভাল লাগছে না। যদি কোন শাস্তি দেবার বাসনা জেগে থাকে আমাকে দিও, আমি মাথা পেতে নেবো। তবু আমার কসম—তুমি আহার্য গ্রহণ করো।

ইয়াকুত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো। রিজিয়ার দিকে। এই সেই সুলতানা। যে সুলতানার চারিদিকে শত্রু। সুলতানা নিজে জানে সে শত্রুর গণ্ডীর মধ্যে সর্বদা প্রাণ নিয়ে বাস করে। যে কোন মুহূর্তে তাকে কেটে টুক্‌রো টুকরো করে দিতে পারে। সে রমণী জানে, তার কেউ নেই এই পৃথিবীতে। সে সম্পূর্ণ একা। সে এই গভীর নিশীথে সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে একজন বিদেশী কর্মচারীর ঘরে ঢুকে রমণীসুলভ সামান্য বাঁদীর মত খিল খিল করে হাসছে। ইচ্ছে করলো ইয়াকুতের—সুলতানাকে তিরস্কার করে তার চেতনা ফিরিয়ে দেয়। তার গুরুদায়িত্বগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণে সে ভাবলো এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গেলে সুলতানা নিজেই হয়ত পরিবর্তে তিরস্কার করে বিপরীত কথা বলবে। তবে ইয়াকুত বেশ ভালভাবেই জানে—রিজিয়া একজন সামান্যা শিথিলমনা সুলতানা নয়। তার মন যথেষ্ট দৃঢ় আছে। সে একটি বৃহৎ রাজ্য পরিচালনা করছে। বাঘা আমীর-ওমরাহ-মালিকদের বশে রেখেছে। তাকে কোন কিছু স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিজেরই বাতুলতা।

রিজিয়া আবার বললো—কি ভাবছো? আহার্য গ্রহণ করবে না? এখনও কি রাগ কমলো না? বলেছি তো যদি কোন শাস্তি দেবার হয় আমাকে দিও! আমার নসীবের দোষ। তার জন্যেই যত গণ্ডগোল।

ইয়াকুত মাথা নেড়ে বললো—এসব কথা বলে আমার আর যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিও না সুলতানা! আমি আজ আহার্য গ্রহণ করতে পারবো না। আমার রুচি নেই।

রিজিয়া ইয়াকুতের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো, হেসে বললো—আমি কি তোমার ঘরের কেউ? মান-অভিমান ভাঙ্গাবো! তবে বলতে পারো—। এই বলে রিজিয়া আবার রমণীসুলভ খিল খিল করে হেসে উঠলো।

ইয়াকুত তাড়াতাড়ি সচকিত হয়ে ঘরের বাইরের দিকে তাকিয়ে সভয়ে বললো—একটু আস্তে সুলতানা। কেউ শুনতে পেলে একটা কেলেঙ্কারী হবে।

রিজিয়া এবার একটু আস্তে শব্দ করে হেসে বললো—কি আর হবে? আগামীকল্য মন্ত্রী গিয়ে আমার পার্শ্বচরের ঘরে বাঁদীর আবির্ভাব ঘটেছিল এই খবরটি শুধু দিয়ে আসবে।

আর তুমি কি করবে?

আমি মন্ত্রীকে আদেশ দেবো যে আমার পার্শ্বচরের বাসস্থান আমার প্রাসাদের

মধ্যেই ব্যবস্থা করে দাও। এই বলে রিজিয়া আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো। হাসি থামলে বললো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল কথা ইয়া। তুমি এবার থেকে আমার প্রাসাদেই বাস করবে। প্রয়োজন হলে এতখানি আসার বিলম্ব আমার সহ্য হবে না। সেইকথা বিশেষ করে বলার জন্যেই আমার আসার কথা ছিল।

ইয়াকুত মাথা নেড়ে বললো—অসম্ভব। এসব দুষ্টুবুদ্ধি সুলতানার মাথায় থাকলে এই বান্দাকে অবিলম্বে ফেরার হতে হবে।

দুষ্টুবুদ্ধি বলছো কি? রিজিয়া বিস্মিত হবার ভাণ করলো। আমার সর্বদাই পার্শ্বচরের প্রয়োজন।

সে পার্শ্বচর পুরুষ। তুমি রমণী।

রমণী বলেই তো পুরুষ পার্শ্বচর দরকার। যার ক্ষমতাকে ভর করে রমণী নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে।

কিন্তু রমণীর পাশে পুরুষ থাকলে তার আসল অর্থ কি দাঁড়ায় নিশ্চয় তোমার জানা আছে!

রিজিয়া খিল খিল করে হেসে বললো—না জানি না। তুমি জানিয়ে দাও। রিজিয়া আবার হেসে উঠল। হাসির দমকে তার দেহের অলঙ্কারে একটা মৃদু সঙ্গীতের তান উঠতে লাগল।

রিজিয়া বলল—আচ্ছা ইয়া, তুমি আমার নাম ধরে ডাকো না কেন? আমি কত সহজে তোমার নাম উচ্চারণ করতে পারলাম আর তুমি পারো না? তুমি বোধ হয় আমাকে ভালবাসো না।

ইয়াকুত উত্তর দিল না। মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখল।

কি, উত্তর দিচ্ছ না কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

কেন নেই? তুমি আমাকে আদর করে 'রাজি' বলে ডাকতে পারো না? আমার আম্মা ডাকতেন আমাকে রাজি বলে। ডাকটা সুন্দর না?

আমাকে মাফ কর সুলতানা। ওসব আমি বলতে পারবো না।

তবে কি আমার সাথে মহব্বত করবে দূর থেকে? কাছে আসবে না। স্পর্শ দেবে না। হৃদয়ের শোণিতে তোমার হৃদয়ের শোনিত মেশাবে না। আদর করে ডাকবে না। আমার সুগন্ধ ঘ্রাণ নেবে না। তুমি কি আল্লার কোরা-আন্ শরিফের পবিত্র মহব্বতের রোশনাই জ্বালাতে চাও? কিন্তু আমরা যে মানুষ ইয়া! মানুষ হয়ে কি করে আল্লার সেই পবিত্র মহব্বতের মসজিদে গিয়ে প্রবেশ করবো? আমি মহব্বত চাই, স্পর্শ চাই, সুখ চাই। আমার অতৃপ্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা চাই। তোমার কাছ থেকে এই ব্যর্থজীবনে একটু শান্তি চাই। তুমি কি আমাকে শান্তি দেবে না?

রিজিয়া যেন কেমন মোহাবিষ্ট হয়ে গেলো। নিশীথরাতের গভীরে রমণী যে আকর্ষণে অভিসারিণী হয়, রিজিয়া যেন সেই আকর্ষণে ছুটে গেল ইয়াকুতের কাছে। ইয়াকুতের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে রিজিয়া কাতর হয়ে বলল—তুমি

কি এই অসহায়া রমণীকে এইটুকু ভিক্ষা দেবে না? আজ দিল্লীর সুলতানা নিজের হৃদয়কে বধ করে সম্রাজ্ঞী হতে চেয়েছে কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল সিংহাসন কখনও বড় হয় না হৃদয়ের চেয়ে। তাকে সে ভুল সংশোধনের একটু সুযোগ দাও! রিজিয়ার চোখে জল এসে পড়লো।

হঠাৎ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হাঃ-হাঃ করে কে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ইয়াকুত ও রিজিয়া উভয়েই চমকে ঘরের দরজার দিকে তাকাল। কিন্তু মূর্তিটি মুহূর্তে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পাষাণ অলিন্দের অন্ধকার প্রকোষ্ঠের দিকে চলে গেল। কালো আলখাল্লা ঢাকা লোকটির অট্টহাসি হাসতে হাসতে বলে গেল—আর বেশী দিন নয় সুলতানা। তোমার সিংহাসনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। হাঃ হাঃ হাঃ।

ইয়াকুত ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেলে রিজিয়া তাকে বাধা দিল। ইয়াকুত ঘণ্টাধ্বনি করে প্রহরীকে ডাকতে গেলে তাতেও রিজিয়া বাধা দিল। বলল—রাত্রির স্তব্ধ প্রহরকে বিশ্রামের শয্যা থেকে তুলে তাকে জবাই কর না ইযা। মিছে গোলমাল করে কি হবে? ওরা প্রমাণ চায়—প্রমাণ পেয়েছে। আমি নির্দোষী তা তো বলিনি। যা সত্য তা রাতের রহস্যে চাপা থাকলেও দিনের আলোয় সম্পূর্ণ মুক্ত। ওরা তবু জানুক—রিজিয়া মন্দা মেয়েলোক হলেও তার মাঝে মাঝে রমণী মন জেগে ওঠে। একথা ইতিহাসও জানুক—রিজিয়া শুধু সুলতানা ছিল না সে রমণী। রমণীর কুসুম নরম হৃদয় নিয়ে জন্মেও স্বপ্নকে বড কবতে হৃদয়কে জবাই করেছে। ঘাতকের শাণিত কৃপাণের তলায় হৃদয়কে দিয়ে সে সুলতানা হয়েছিল। কিন্তু সে কর্তব্য থেকে কখনও সরে যায়নি।

ইয়াকুত বললো, কিন্তু লোকটাকে না ধরে তাকে ছেড়ে দিলে কেন?

কারণ লোকটাকে ধরা যেত না। তাছাড়া শুধু শুধু সেই নির্দোষীকে শাস্তি দিতে আমায় বিচারের আসনে বসতে হত। তার প্রাণদণ্ড হতো। কিন্তু আসল লোক অন্তরালে থেকে যেতো। এর পিছনে যে কারা আছে, কারা যে আমাকে কলঙ্কিনী প্রতিপন্ন করতে চায় সব আমি জানি। সেইজন্যে লোকটাকে ধরবার জন্যে অহেতুক ব্যস্ত হয়ে উঠলাম না। হয়ত ঘণ্টাধ্বনি করলে প্রহরীরা ছুটে আসত কিন্তু এসে আমাকে এখানে দেখে তারা মনে মনে কৌতুক বোধ করতো—সেই লজ্জা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করলাম।

ইয়াকুত বলল—কিন্তু এই দেখেই বুঝতে পারছো, ওরা সর্বদা তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

সেইজন্যেই তো বলছি, আমরা ভীরু নয়, আমাদেব যে সাহস আছে, আমাদের যে ক্ষমতা আছে সেটা প্রমাণ করবার জন্যেই আমরা আরও মুক্ত হব।

কিন্তু এত বড় রাজ্যে আমরা দুজন কি করব?

রিজিয়া ম্লান হেসে বলল—তুমি শুধু আমার পাশে থাকো, আর মাঝে মাঝে বুদ্ধিভ্রষ্ট হলে বুদ্ধিতে শান দিয়ে দিও। তাহলে তোমার এই 'রাজি' সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে কাটিয়ে তুলতে পারবে।

ইয়াকুতের জানালার গবাক্ষ দিয়ে চাঁদের রূপোলী রোশনাই রমণীরূপের জ্যোতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল। হঠাৎ রিজিয়ার চোখ দুটি সেইদিকে তাকিয়ে আটকে গেল। মৃদু হেসে ইয়াকুতের দিকে তাকিয়ে বললো—ইয়া, একটা অনুরোধ আমার রাখবে? এই রাত্রে আমার সঙ্গে একটু অশ্বারূঢ় হয়ে যমুনার তীর পর্যন্ত যাবে?

যমুনাতীর? ইয়াকুত অস্ফুটস্বরে কথাগুলি উচ্চারণ করলো।

হ্যাঁগো হ্যাঁ। ছাখো না, তোমার ঘরে চাঁদনী রোশনাই তার যৌবন নিয়ে কেমন খেলা করছে? এর আসল রূপ দেখতে হলে এই রাত্রে যমুনার পাণিতে গিয়ে চোখ রাখতে হবে। যমুনার পাণিতে চাঁদনী রোশনাই রমণীর যৌবন-চাপল্য ক্রীড়া করে ফিরছে। চল না ইয়া! দেখলে তুমি সার্থক হয়ে যাবে। আমি কতদিন আব্বার সঙ্গে এই রাত্রে গিয়ে যমুনার এই রূপ দেখে এসেছি।

ইয়াকুত বিস্ময়ে বলল—কিন্তু সে তো অনেক পথ? তা ছাড়া এই গভীর রাত। কাজটা কি ভাল হবে?

'ডরো মৎ ইয়া।'

তুমি পাশে থাকলে আমি একাই যুদ্ধে সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করতে পারি। তুমি কি জানো না, একটি পুরুষের শক্তি একটি রমণীকে আরও শক্তিময়ী করে!

দিল্লী সাজানো নগর। তুর্কী-সুলতানের পরিচ্ছন্ন মনের পরিচায়ক। সমগ্র উত্তর ভারতের রাজত্বকে সুশৃঙ্খলার মধ্যে রাখবার জন্তে তুর্কী-সুলতানরা রাজ্যের ভূমিকে সুরম্য ও সুসজ্জিত করে রেখেছে। তুর্কী-সুলতানদের সুশিক্ষিত মনের পরিচয় তাঁদের শাসিত রাজ্যের চারিদিক দেখলে প্রতীয়মান হয়। পথের দু'পাশে বৃক্ষাদি রোপণ করে ছায়ার সৃষ্টি করা হয়েছে। ঘোড়সওয়ার যাওয়ার জন্যে প্রশস্ত পথ। জঙ্গলাকীর্ণ বাধা বিপত্তিগুলি অপসারণ করে পুষ্পবৃক্ষের শোভা সর্বত্র। বেলা, মল্লিকা, চামেলী, গন্ধরাজ প্রভৃতি নামারঙের ফুলে পথের দু'পাশ সুসজ্জিত।

রিজিয়ার পিতা আলতামাস অনেক বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের কাল ছিল ছাব্বিশ বছর। তিনি এই ছাব্বিশ বছর একাদিক্রমে উত্তর ভারতে রাজত্ব করে—সমস্ত হিন্দুস্থান পর্যন্ত তাঁর রাজ্যবিস্তার লাভ করেছিল। তিনি তুরস্কের 'ইলবারি' শাখায় উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে তাঁর শিল্পানুরাগ সর্বজনবিদিত ছিল। তাঁরই চেষ্টায় তাঁর শাসিত সমস্ত রাজ্য সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত হয়ে উঠেছিল।

রিজিয়া সেই আলতামাসের কন্যা। পিতার শিল্পানুরাগ তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। রিজিয়া তাই তার নিজের মনের মত করে নগরীর শোভাবর্ধন করেছিল।

চাঁদের রূপোলী রোশনাই সেই শোভার ওপর পড়ে রাতের রূপকে আরও সৌন্দর্যপূর্ণ করেছিল। আসমানের উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপস্থিতিও সেই সৌন্দর্যের অংশীভূত। নিস্তব্ধ রাত্রে অপরূপ স্তব্ধ রূপের মধ্যে সুষুপ্তিময় নগরীর ভেতর দিয়ে শুধু দুটি অশ্বারোহীর পায়ের শব্দ মুখরিত হয়ে উঠছে।

দুটি শ্বেত অশ্বের গায়ে চাঁদনী রোশনাই। পাশাপাশি দুটি অশ্বের পিঠে সুলতানা রিজিয়া ও ইয়াকুত। দ্রুত চলেছে অশ্ব। সঙ্গে কোনো সাথী ঘোড়সওয়ার

নেই। এখনই যদি কোন শত্রু তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—তাহলে প্রাণ যাবার আশঙ্কা বিদ্যমান। তবে দুজনেই অত্যধিক সাহসী। রণকৌশলে সিদ্ধহস্ত। রিজিয়ার কাছেও একটি ছোরা একটি তরবারি ছিল।

যমুনার পাণিতে চাঁদের রূপদর্শনে প্রাণ মনে আনন্দের পরশ বুলোতে বুলোতে চলেছে। কিন্তু সঙ্গে অস্ত্র নিতে ভোলেনি। এই কিছুক্ষণ আগে তার গতিবিধির অনুসন্ধানে লোক নিয়োজিত হয়েছে—তার প্রমাণ হয়ে গেছে। এখনও যে কেউ না কেউ তাদের এই নৈশ ভ্রমণ প্রত্যক্ষ করছে না—বিশ্বাস হয় না। এমন কি হয়ত অতর্কিতে একদল অশ্বারোহী সৈন্য তাদের আক্রমণ করে এই নিস্তব্ধরাত্রে যমুনার জলে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে পারে।

দ্রুত অশ্বের গতি যমুনার তীরভূমি লক্ষ্য করে। রিজিয়া ইয়াকুতের পাশাপাশি চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, একটু আস্তে ইয়া। আমরা কি শত্রুনিধনে এগিয়ে চলেছি?

কিন্তু পথে কোন শত্রুর মুখোমুখি পড়তে পারি তো!

রিজিয়া হেসে বলল—যার ঘরে শত্রু তার শত্রুকে ভয় করে লাভ কি? তার চেয়ে আস্তে চল। অন্ততঃ আজকের রাত্রের এই মোহিনী দৃশ্য মনের মধ্যে স্মৃতি করে জীবনকে অক্ষয় করে রাখি। হয়ত এদিন আর নাও আসতে পারে। তুমি পাশে আছ। তোমার সাথে এই নিভৃত রাতের সুষুপ্তিময় নগরীর উন্মুক্ত পথ দিয়ে যমুনা-বিহার করতে যাচ্ছি—ভাবতেও মনের মধ্যে রোমাঞ্চ লাগছে। অন্ততঃ এই সুন্দর ভাবনাকে জবাই করে শত্রুর ভয় দেখিও না।

আবার পথ। আবার নিস্তব্ধতা। আবার চাঁদের রূপোলী রোশনাই দিগন্তকে পরিব্যাপ্ত করেছে। সুষুপ্তিময় নগরীর জায়গায় জায়গায় নগরবাসীর ঘর। দিনের বেলায় এ পথ দিয়ে প্রায় রোজই রিজিয়া নগর-ভ্রমণ করে। কিন্তু রাত্রিবেলা এই পথে অনেকদিন পর এই প্রথম। তাই সুষুপ্তিময় নগরীকে দেখে রিজিয়ার অনেকদিন পর একটা চিন্তা মনকে ছেয়ে দিল।

আজ এই সমস্ত ভূমির একমাত্র অধিকারিণী সে নিজে। আগামী কল্য সে যদি এই সমস্ত নগরবাসীকে উচ্ছেদ করতে চায় তাহলে নগরবাসীর কেউই তাকে বাধা দিতে পারবে না। সমস্ত নগরকে আগুণে দগ্ধ করে দিতে পারে। কয়েক সহস্র অশ্বারোহী পাঠিয়ে তরবারী দিয়ে ছেদন করে নগরবাসীদের এই রকম পদ্ধতিতে শাস্তি দিলে তবে রাগ যায়। এরা তার সম্বন্ধে নানা নোংরা আলোচনা আর্যাবর্তের চারিদিকে ছড়িয়েছে। আসলে সে বোঝে—ঈর্ষা। রমণী রমণীকেই বেশী ঈর্শা করে। লাহোর, পাঞ্জাব, সিন্ধু, মুলতান প্রভৃতি প্রদেশের লোকেরাও তার বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য করতে শুরু করেছে। এর আসল গোড়াপত্তন এই দিল্লীর অভ্যন্তরে। এখানকার রমণীরা গৃহস্থ হয়ে এক তুর্কী রমণীকে সিংহাসনে বসতে দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যেমন তার বহিন আসমান। আসমান তাকে 'মর্দা' বলে। কেন বলে সে তা জানে। আসমানকে ক্ষমা করেছে উপায় নেই বলে। কিন্তু এই

নগরবাসী তার অনুগ্রহে তারই রাজ্যের ভূমিতে বাস করছে। বেইমানদের শাস্তি কি বেশ ভালভাবেই জানে রিজিয়া। কিন্তু এখন চুপ করে থাকতে হবে। একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি জট পাকিয়ে পাকিয়ে আস্তে আস্তে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা চলছে। রাত্রি নিস্তব্ধ হলে প্রাসাদের পাষাণ প্রকোষ্ঠের অন্ধকার অলিন্দে কে বা কারা ফিসফিস করে গোপন পরামর্শ করে। রিজিয়া যেন শুনতে পায় তাদের কথা। বাতাসে যেন তাদের কথার আসল অর্থ উড়ে উড়ে এসে রিজিয়াকে সংবাদ জানিয়ে যায়। সাবধান করে বলে যায়—হুঁশিয়ার!

হুঁশিয়ার রিজিয়া সর্বদাই আছে। কে বা কারা—কোত্থেকে বিদ্রোহের ধোঁয়ার প্রথম দাবাগ্নি জ্বালাবে—সে তা জানে। জানে বলেই তার চিন্তা। সমস্ত দিকে সম্পূর্ণ সচেতন দৃষ্টি রেখে কাজ না করলে সিংহাসন তো যাবেই—তার সাথে প্রাণের মায়াও ছাড়তে হবে। কিন্তু ইয়াকুত বিশ্বাসী? সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে হঠাৎ একটা চমক লাগল। রিজিয়ার একটি অভ্যাস ছিল, মনের মধ্যে যে কথা উদয় হত সেটা যথার্থ কি না—সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিত। তাই যখন ইয়াকুতের সম্বন্ধে ঐ ধরণের কথা মনে এল সে পথের মাঝে চলমান অশ্বের গতিরোধ করে ইয়াকুতের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—আচ্ছা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি, ইয়া!

ইয়াকুত আচমকা এই ধরণের কথা শুনে রিজিয়ার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল, তারপর বলল—হঠাৎ এই ধরণের প্রশ্ন সুলতানার মনে উদয় হল কেন?

রিজিয়া হেসে বলল—আমার অপরাধ নিও না ইয়া। আমি বুঝতে পাচ্ছি, আগামী দিনে আমাকে আবার আর একটি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের মুখোমুখি হতে হবে। এবং সেই বিদ্রোহের সুচনা এই রাজ্যের সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে জেনে নিতে হবে আমাদের কে শত্রু আর কে মিত্র। কারণ কাকে আমি বিশ্বাস করব—আর কাকে করব না। তবে বিশ্বাস করার মত আর কেউ নেই। দু'একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছাড়া সবাই বিদ্রোহীদের দলে। এক তুমি বাকী। তোমার কাছে জিজ্ঞেস করলাম এইজন্যে যে তোমার স্পষ্ট উক্তিটা আমার আগামী কার্যসূচনায় সাহায্য করবে বলে।

ইয়াকুত হঠাৎ অশ্বের পিঠ থেকে মাটিতে নেমে নিজের কোমরের খাপ থেকে তরবারিটা আসমানের দিকে উঁচু করে তুলে বলল—জালাউদ্দীনের কলিজায় একফোঁটা খুন থাকা পর্যন্ত সে দিল্লীর সুলতানার সাহায্যে লাগবে।

ধন্যবাদ ইয়া। স্মিতহাস্যে রিজিয়া ইয়াকুতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—আমি জানি ইয়া, একথায় তোমার মনে গোঁসা হবে। কিন্তু আল্লার দোহাই, আমি কোন মন্দ অভিপ্রায় মনে গ্রহণ করে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নি। আমি বুঝতে পাচ্ছি না কে যে আমার মিত্র—আর কে যে আমার শত্রু। মন্ত্রী, সেনাপতি, মালিক, সামন্ত, আমীর-ওমরাহরা সবাই আমায় শ্রদ্ধা করে। কিন্তু পিছনে গেলে এরা সবাই আমার বিরুদ্ধে নানা পরামর্শ করে। আমি শুনতে পাই এদের সেই পরামর্শ। কিন্তু একসময় কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ি।

আবার দুটি অশ্বারোহী যমুনাতীর লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। একটা বাঁকের মুখে এসে দুজনেই শুব্ধ হয়ে দাঁড়াল। অনেকদূর থেকে যেন মনে হল দ্রুত একটি অশ্বারোহী প্রাসাদের পথ দিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে।

ইয়াকুত তড়িৎবেগে পথের একপাশে বৃক্ষাদির আড়ালে সরে এসে খাপ থেকে তরবারী বের করে নিল। রিজিয়াও ইয়াকুতের মত তদ্রূপ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যে অশ্বারোহী ইয়াকুত ও রিজিয়া যেখানে লুকিয়ে ছিল সেই ঘন বৃক্ষাদির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর চতুর্দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল। অশ্বরোহী দ্রুত পথের বাঁকে মিলিয়ে গেলে ইয়াকুত ও ও রিজিয়া গোপনস্থান থেকে বেরিয়ে এসে আবার এগিয়ে চলল।

আরও কয়েক গজ এগিয়েই পাওয়া গেল যমুনাতীর। যমুনার কালো জলে চাঁদের রূপোলী আলো পড়ে অপূর্ব রূপের সৃষ্টি হয়েছে। হাজারো রোশনাইয়ের বৈদ্যুতিক চমক যমুনার জলে। যেন হাজারো মাসুম লেডকীর স্পর্শহীন যৌবনের কামনা লালসার আগুনের ফুল্‌কি। নিস্তরঙ্গ যমুনার স্রোত। দূরে ওপারের শেষ দেখা যায়। দিনের মত স্বচ্ছ আলোতে সব যেন আরও স্পষ্ট ও আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সুলতানা রিজিয়া যমুনার দিকে তাকিয়ে ছেলেমানুষ হয়ে উঠল। খিল খিল করে হেসে সে উন্মুক্ত যমুনার তীরকে উচ্ছল করে তুলল। অশ্বের পিঠ থেকে নেমে সে চীৎকার করে আসমানের দিকে তাকিয়ে বলল—'ইয়া খোদা মেহেরবান, তুমি এই পৃথিবীর পিতা হয়ে কি অপূর্ব রাজত্ব বিস্তার করেছ। আর আমি এই এক মাসুম লেড়কী, আমি এক সামান্য রাজ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে চালাতে পারি না।'

রিজিয়া কাঁদল। রিজিয়া হাসল। রিজিয়া যমুনার তীরে ছোট্ট মেয়েটির মত উচ্ছল হয়ে নাচল। ইয়াকুত চেয়ে চেয়ে শুধু দেখল। শুধু শুনলো। শুধু উপভোগ করল। সে রাতের স্মৃতি চির অক্ষয় হয়ে থাকল। ইতিহাসে হয়ত সে রাতের কাহিনী লেখা থাকবে না। কিন্তু ইয়াকুত যতদিন বাঁচবে—ততদিন জেনে থাকবে, রিজিয়া একটি রাতের জন্য তার মনকে উদ্‌ঘাটিত করেছিল।

সে রমণী। সে পুরুষের বেশে রাজ্য পরিচালনা করলেও তার রমণী মন—রমণীয় মন। তার হৃদয় ছিল। সে হৃদয়ে ছিল মমতা। যে মমতা তুর্কী রমণীর হৃদয়ে বিরল। তার মন হিন্দু রমণীর ছাঁচে গড়া। সে বঁধু। সে প্রেমিকা। কিন্তু সুলতানা। সুলতানা হবার তপস্যা নিয়ে জন্মেছিল বলে আজীবন সে দৃঢ় হস্তে রাজদণ্ড ধরে রাজ্য শাসন করে গেছে! অপরাধীর বিচার করেছে। এই হাতে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছে। কিন্তু মানুষকে হত্যা করার ইচ্ছা তার ছিল না। মানুষের মমতা দিয়ে গড়া মন মানুষকে কখনও বধ করতে পারে না।

এর কদিন পরে।

রিজিয়া সর্বদা আশা করছিল আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কোথা থেকে শুরু হয় দেখবে। কারণ তার রাজ্যে কখন কোথায় কি হচ্ছে সবই তার নখদর্পণে। জানা না থাকলে,

রমণী হয়ে এই উচ্ছৃঙ্খল প্রজাদের বশে রাখতে পারত না। পিতা আলতামাস যেমন এই দুই পারিষদবর্গকে শাসনের দণ্ড দিয়ে বশে রেখেছিলেন, রিজিয়াও পিতার শাসন-পদ্ধতির অনুকরণ করেছে। কিন্তু পিতা আলতামাসের কঠোর শাসনে রাজ্যের লোকেরা যেমন বশে ছিল, তার বৈমাত্রেয় ভাই রুকনউদ্দীনের রাজ্য পরিচালনায় তাদের ঘুমন্ত দুষ্টবুদ্ধি আবার জেগে উঠেছিল। রুকনউদ্দীনের যত ভোগবিলাসের স্রোত ভীষণ উদ্দাম হয়ে উঠল—কোষাগারের ধনরত্ন অঢেলভাবে ব্যয় হতে কার্পণ্য হল না। তত রাজ্যের আমীর মালিকেরা শিথিল হয়ে পড়তে লাগল। যখন রিজিয়া সিংহাসনে বসল তখন এদের বশে আনতে তাকে বেশ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হল। সেই থেকে সে জানে রাজ্যের আমীর ওমরাহদের মনোগত অভিপ্রায় কি।

সেদিন রাতের ঘটনার পর সে সর্বদাই প্রত্যাশা করছিল—তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একদল লোক গোপনে পরামর্শ করছে—এবং তারা কোন দিক দিয়ে তাকে আক্রমণ করবে তাই এখন চিন্তার বিষয়। আবার এদের সঙ্গে আছে ইতিগীন ও তার কুলাঙ্গার বৈমাত্রেয ভাই বহরাম। বহরাম তার রঙমহলে এদের জৈবিক ক্ষুধার খোরাক পরিবেশন করে। ইন্দ্রিয়ের সুখের ইন্ধন যুগিয়ে সে এদের বশ করেছে। আর ইতিগীন। তার আক্রোশ! সে ইয়াকুতের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে রিজিয়াকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করছে। অথচ একেই সে খুশী হয়ে রাজপ্রাসাদের পরিরক্ষক করেছিল। এখন তার সে পদ কেড়ে নিতে গেলে আমীরওমরাহদের বিরাগভাজন হতে হবে। ষড়যন্ত্রের ওপর অগ্নিসংযোগ করা হবে।

কি ভুলই যে-সে করেছে! হৃদয়ের মমতা যেখানেই স্পর্শ করেছে, রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা সেখানেই জেগে উঠেছে। অথচ হৃদয়কে বধ করে রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। অপরাধীকে শাস্তিও যেমন দিয়েছে রিজিয়া—লঘু অপরাধকে ক্ষমাও করেছে অনেক সময়। ক্ষমা করাব সময় তার রমণীর রমণীয় মন উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে খুব গোপনে। তাব দুর্বল মনের খবর পেলে সিংহাসনের পাশে দণ্ডায়মান বন্ধুরাই শয়তানের রূপ ধরে তাকে সিংহাসনচ্যুত করবে।

কিন্তু ইতিগীনের প্রতি যে মমতা দেখিয়ে ভুল করেছে, ইয়াকুতের প্রতি সে ভুল করেনি। ইয়াকুত বিশ্বাসী। বিদেশী বন্ধু। তার প্রতি দুর্বল হয়ে সে ভাল কাজই করেছে। ইতিগীনকে স্নেহ দেখিয়ে সে অন্যায় করেছে—ইয়াকুতকে ভালবেসে সে ভুল করেনি।

রিজিয়ার খাসবাঁদী দুজন। ফিরোজা ও মরিয়ম। মরিয়মকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কথাটা প্রথমে শুনে রিজিয়া খুব আমল দেয় নি। কারণ তার মহলের বাঁদীরা তার কড়া পাহারার মধ্যে বাস করে। সেখান থেকে তারা বাইরে গিয়ে কারুর সঙ্গে মজে রাত কাবার করবে—সে চিন্তা করতে পারে না। সেইজন্য মরিয়ম বাঁদী মহলে নেই, একথা প্রচারিত হলেও বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। কিন্তু পরে জানা গেল সত্যিই সে রিজিয়ার খাসমহল থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

রিজিয়া যখন সত্যিই বিশ্বাস করল, মরিয়ম অদৃশ্য হয়েছে তখন সে চমকে উঠল। আবার নিশ্চিন্ত হল এই ভেবে যে, মরিয়ম বহুকাল ধরে এক সৈনিকপুরুষকে ভালবাসে। সে কথা রিজিয়া গোপনে সংগ্রহ করেছিল। সৈনিকপুরুষটির নাম নসরুদ্দীন। কিন্তু রিজিয়া রাজ্যে নরনারীর মেলামেশা আইন করে বন্ধ করে দিয়েছিল। এমন কি বিয়ে-শাদী পর্যন্ত সুলতানার হুকুম ছাড়া হবে না। তাই যখন শুনল, শাস্তি দেবার ব্যবস্থা মনে মনে করেছিল। কিন্তু মরিয়মকে সে স্নেহ করে। যে ঘটনা সবার অগোচরে আছে সে ঘটনাকে লোকচক্ষে তুলে ধরে বে-আইনি সাব্যস্ত করতে রিজিয়ার ইচ্ছা করল না। তা ছাড়া মরিয়মের ফুলের মত সুন্দর মুখটি কল্পনা করে সে তার অপরাধের কথা বিস্মৃত হতে চাইল।

এসব ক্ষেত্রে অবশ্য ফিরোজা একেবারে অভিন্ন। সে সুলতানার পন্থাই অবলম্বন করেছে। সুলতানার মত রমণী মনের প্রবৃত্তিগুলিকে চাপা রেখে সে সুলতানাকে অনুসরণ করে। এক একসময় অবশ্য মন ভাল থাকলে রিজিয়া ফিরোজাকে জিজ্ঞেস করেছে—হ্যাঁরে, তুই কি সুলতানার ব্রতই গ্রহণ করলি? শাদী করবি না? তোর জন্তে যে রাজ্যের বড় বড় আমীররা পথ চেয়ে দিন গুণছে। রিজিয়া হাসল।

ফিরোজার উত্তর কিন্তু খুব গম্ভীর প্রতিশব্দ—"গোস্তাখি মাফ কর সুলতানা বেগম। আমি যেন আমার সুলতানার পথানুসরণ করতে পারি।

চমকে উঠেছে সুলতানা রিজিয়া। 'সুলতানার পথানুসরণ করতে পারি'—এ প্রতিশব্দে সুলতানা তার হৃদয়ের অন্ধ গলিগুলিতে হাতড়িয়েছে। ফিস্ ফিস্ করে নিজেকে নিজেই শুনিয়েছে—"সে কি সত্যি পুরুষ ছাড়া জীবন যাপন করতে পারে?" তারপর সে তাড়াতাড়ি চারিদিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখেছে—কেউ শুনেছে কি-না তার কথা।

ফিরোজা কিন্তু আজও নিষ্পাপ। সে কোন রাজপুরুষকে মনে মনে কল্পনা করে না—এ সন্ধান রিজিয়া বেশ ভালভাবেই নিয়েছে।

কিন্তু মরিয়ম সম্পূর্ণ ফিরোজার ভিন্ন। তার চলনে, কথাবার্তায়, চোখের চাহনিতে রিজিয়া দেখেছে তার মনে নানা আশা। শুধু ভয়ে তার হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ। সে খাসমহলের বাঁদী। তার পদমর্যাদার গুরুত্ব অনেক বেশী। সে সুলতানার পাশে পাশে থাকে। তার বাচালতা যে সুলতানা ক্ষমা করবে না সে জানে। তাই তার দেহের ঐশ্বর্য্যের বর্ণাঢ্য সে ম্লান করে রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু অগ্নিকে সিন্দুকের মধ্যে গোপন করে রাখলে তা থাকবে কেন। তার প্রকাশ আশেপাশের মানুষের চোখ ধাঁধাবে। তাই মরিয়মের যৌবনের গোলাম আসতে দেরী হয় নি। নসরুদ্দীনকে রিজিয়া দেখেছে। সৈনিক যুবকটি খুব শীঘ্র নিজের ক্ষমতায় উচ্চপদে উন্নীত হবে। মরিয়ম একে আপন করে খুব ভুল করেছে।

কিন্তু মরিয়ম অদৃশ্য হ'য়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। নসরুদ্দীন সেনা-প্রাসাদে থাকলে হয়ত চিন্তা করা যেত মরিয়ম নসরুদ্দীনের অভিসারিকা হবার জন্তে আত্মগোপন করেছে। কিন্তু সে আজ অনেক মাইল দূরে যুদ্ধক্ষেত্রে। রণথম্বোর দুর্গে সেনাপতি

হসনঘোরির সঙ্গে যুদ্ধ করে রণথম্বোর দুর্গ দখল করতে গেছে। যদি সে রণথম্বোর দুর্গ জয়লাভ করে আসে সুলতানা তাকে উচ্চ পদমর্যাদায় ভূষিত করবে, খেতাব দান করবে।

তাহলে মরিয়ম কোথায় গেল? চিন্তায় পড়লো রিজিয়া। প্রাসাদের খোজা-প্রহরীদের ডেকে আদেশ দিল, চব্বিশঘণ্টার মধ্যে মৃত-অথবা জীবিত মরিয়মকে তার চাই।

খুসক্‌ফিরোজী প্রাসাদ থেকে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত। সুলতানার কঠোর আদেশ চারিদিকে প্রচারিত হল—জীবিত অথবা মৃত মরিয়মকে চাই।

হ্যাঁ চাই। রিজিয়া মরিয়মের লাশই দেখতে চায়। দেখতে চায় মরিয়ম বেগুণা, না অপরাধী। তাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে তার ইজ্জতকে পিষে দিয়েছে, না-সে নিজে স্ব-ইচ্ছায় তার সম্ভ্রমকে একজন শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছে। তাই মৃত অথবা জীবিত মরিয়মকে চাই। জীবিত থাকলে রিজিয়ার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তার পাপের শাস্তি লঘু করবে অথবা মৃত হলে রিজিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে তার দেহের প্রতিটি রেখা পরীক্ষা করে তারপর নিশ্চিন্ত হবে।

চব্বিশ ঘণ্টার আগেই মরিয়মের দেহ পাওয়া গেল। বহরামের রঙমহলে নর্তকীদের ঘর থেকে উদ্ধার করা হল। রিজিয়া যখন মৃতপ্রায় মরিয়মকে দেখল তখন সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ফুলের মত নরম সুন্দর প্রাণচঞ্চল একটি রমণী দেহ। যাকে দেখে রিজিয়া কতদিন হতবাক হয়ে থেকেছে। মরিয়মের সৌন্দর্য যেন খুসক্‌ফিরোজী প্রাসাদ-মহলের ঐশ্বর্য। রিজিয়ারও রূপ জগদ্বিখ্যাত কিন্তু সে সুলতানা। তার দেহে আছে সুলতানার ধনরত্নের ঐশ্বর্য। রাজকোষের সেরা মণিমুক্তা তার অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করে। কিন্তু মরিয়ম বাঁদী হয়েও যেন সুলতানার মণি-মুক্তা, হীরা-জহরতের ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করেছে। ঈর্ষা হয় নি রিজিয়ার—ভয় করতো মরিয়মের সৌন্দর্য দেখে। সেই মরিয়মের এই অবস্থা দেখে তার শোণিতে দাহ সৃষ্টি হলো। ক্ষুব্ধ চোখে শাণিত দৃষ্টি নিয়ে রক্তশূন্য নিস্তেজ লতানো দেহটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কারা যেন ক'টি রাতে একটি রমণীদেহের সৌন্দর্যটুকু চুষে নিয়েছে। কারা আবার? কে যে এ কাজ করেছে রিজিয়া জানে? কার এত সাহস হবে তাও জানে রিজিয়া। রুকনউদ্দীনের মত যদি বহরামকে সে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিতে পারতো? কিন্তু রুকনউদ্দীনকে সে যত সহজে শেষ করে দিতে পেরেছে। বহরামকে সেভাবে পারবে না। কারণ বহরাম উচ্ছৃঙ্খল হলেও কৌশলী। সে জানে, আমীর-ওমরাহদের কি করে বসে রাখা যায়। তার কথায় অনেক আমীর-ওমরাহ মালিকরা প্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করতে পারে। বহরামকে উচ্ছেদ করতে গেলে বিদ্রোহের দাবানল আর চাপা দেওয়া যাবে না। তার চেয়ে এদের বশে এনে রাজ্যের বিদ্রোহ কমিয়ে তারপর বহরামকে চরমতম শাস্তি দিতে হবে।

কিন্তু মরিয়ম? মরিয়ম দিল তারই জন্য ইজ্জত-বলি?

রিজিয়া তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরুদ্দীনকে কোরাণ শরিফের মর্মার্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিল। নাসির অত্যন্ত একনিষ্ঠ শ্রোতা ও প্রিয় ছাত্র। সম্পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে সে ভগ্নীর কাছে কোরাণ শরিফের ধর্ম কথা শুনছিল। সামনে মেহগিনি কেদারার ওপর রাখা বৃহৎ কোরাণ শরিফটি। 'হারানো ইউসুফের' জন্য তার মন কাতর হয়ে উঠেছিল। এই সময় মরিয়মের দেহ নিয়ে খোজা প্রহরীরা প্রবেশ করল।

তাই আর কিছু ভাবতে না পেবে তার মহলে মরিযমের অচৈতন্য দেহটি পাঠিয়ে দিল সেবা শুশ্রূষার জন্যে এবং জ্ঞান ফিরে এলে যেন সুলতানাকে খবর দেওয়া হয় একথা জানিয়ে দিল। মরিয়মের দেহ নিযে বাহকেরা চলে গেলে রিজিয়া আবার কোরাণ-শরিফে মন দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু মন বসল না। 'হারানো ইউসুফের' জন্য যত না মন তার কাতর হল, মরিয়মের জন্য তত বেশী কাতর হল। বেচারী মরিয়ম। বেগুণা মরিয়ম। নিষ্পাপ মরিয়ম।

সুলতানার ইজ্জতের মূল্য দিয়ে সে নিজের ইজ্জত বিলিয়ে দিল।

সুলতানার সম্মানকে রক্ষা করে সে নিজের সম্মানকে বলি দিল। রিজিয়া পবিত্র কোরাণ-শরিফকে আদাব জানিয়ে, নাসিরকে বিদায় দিয়ে, সে উঠে এল নিজের খাসকামরায়।

না-না-না। এ সহ্যের অতীত। সে সুলতানা। এরা এই কুক্কুরের দল তুর্কীজাতির সম্মানকে পৃথিবীর চোখে হেয় করে কোরাণ-শরিফকে ছুরিকাহত করবে এ কখনই সহ্য করা যায় না। হাঁ্যা কোরাণ-শরিফ। পবিত্র কোরাণের মত রমণীহৃদয় পবিত্র। সেই পবিত্র রমণীহৃদয়কে একজন শয়তান রক্তাক্ত করেছে। তাকে শাস্তি না দিলে সে নিজে দোষী সাব্যস্ত হবে। খোদা তাকে মেহেরবাণী করবে না। সে সুলতানা নয়, সে আল্লার প্রেরিত দূত। সে যদি তার ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন না হয় তাহলে সে নিজে দোষী। ক্ষমতার অপব্যবহার না করে ব্যবহার করাই খোদার অভিপ্রেত।

কিন্তু রিজিয়া ভেবে পেল না সে কি করবে? বহরামকে শাস্তি দেওয়া তার সাধ্যাতীত। বহরামেব রঙমহলকে উচ্ছেদ করাও তার দ্বারা হবে না। অথচ সে জানে যে রিজিয়ার প্রিয় বাঁদী মরিয়মকে নষ্ট করলে রিজিয়া শাস্তি পাবে। রিজিয়াকে সব সময় অপদস্থ করারই ইচ্ছা তার। কিন্তু মরিয়মের ফুলের মত নিষ্পাপ হৃদয়কে নষ্ট করে বহরাম রিজিয়াকে যতটুকু শাস্তি দিয়েছিল ভেবেছে—তার চেয়ে অনেক বেশী শাস্তি রিজিয়া পেয়েছে।

রিজিয়া ভাবে, তার নিজের ইজ্জত খোয়া গেছে। তার নিজের রক্ত বৈমাত্রেয় শয়তানভাই বহরাম চুষে নিয়েছে। একই পিতার রক্ত দেহে থাকা সত্ত্বেও সে থামেনি। এমনি কুলাঙ্গাব ভাই তার। মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক। ঘৃণ্য।

বেচারী নসরুদ্দীন। হয়ত মনের কত উদ্যম নিয়ে সে রণথম্বোর দুর্গ শত্রুর হাত থেকে উদ্ধারের কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। হয়ত জয় হবে শুধু তারই জন্যে। তারই রণকৌশলে শত্রুরা পরাজয় স্বীকার করবে। ফিরে এলে সেনাপতি হসনঘোরির মুখে জানা যাবে, নসরুদ্দীনের কৃতিত্ব। রিজিয়া স্মিতহাস্যে বীরকে কুর্নিশ করে তাকে সম্মানীয় পুরস্কার

দানে ভূষিত করবে। নসরুদ্দীন হয়ত সমস্ত লজ্জা ভয় ত্যাগ করে মরিয়মের পাণি-প্রার্থনা করবে।

রিজিয়া নসরুদ্দীনের বীরত্বে খুশী। তার আরজি মঞ্জুর করতে দ্বিধা করবে না।

কিন্তু নসরুদ্দীনের সমস্ত আশা-ভরসা, সুখ-আহ্লাদ, প্রেম-প্রীতি, দিল্লী·নগরে প্রবেশ করলেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তার বিজয়োল্লাস অপরে উপভোগ করবে আর সে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় ব্যক্তিগত যুদ্ধের আয়োজন করবে। কে তার হৃদয়ের কুসুমটি ছিঁড়ে নিয়েছে তার জন্ম তরবারী শানাবে।

এ সবই ষড়যন্ত্র। রিজিয়া বুঝতে পারে ওরা ষড়যন্ত্র করেই এক ঢিলে 'দুই পাখী' বধ করেছে। বেগুণা মরিয়ম ইজ্জত দিয়েছে। কিন্তু অপরাধী দুজন—নসরুদ্দীনের মহব্বতের কথা ওদের অজানা নয়। নসরুদ্দীন মরিয়মের মত খুবসুরত জোয়ানি লেড়কিকে উপভোগ করবে—ওরা তার জন্যে ঈর্ষান্বিত। হয়ত ওরা মরিয়মকে তার কাছ থেকে চেয়েছিল। দেয়নি বলে—নসরুদ্দীনের অবর্তমানে মরিয়ম বলি হয়ে গেল। এছাড়া রিজিয়ার প্রিয়বাঁদীর ইজ্জত তার মহল থেকে নিয়ে গিয়ে পিষে দিয়েছে। কতদূর স্পর্দ্ধা থাকলে সুলতানার ইজ্জত নিয়ে শয়তানরা খেলা করে। সুলতানার ইজ্জত ছাড়া কি? তার মহলের ইজ্জত গেলেই তার ইজ্জতে হাত পড়ে। মরিয়ম শুধু যায়নি, সুলতানার ইজ্জতের সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে। দিল্লীর তুর্কী সিংহাসনের পবিত্রতা কলঙ্কিত হয়েছে।

একজন বীর যখন সজল চোখে এসে তার কাছে ভিক্ষা চাইবে তখন সে কি বলবে? বলবে সে সুলতানা হয়েও অক্ষম। তার শক্তি আলতামাসের শক্তি নয়। তারই খাসমহল থেকে বাঁদীকে চুরি করে শয়তানরা তাদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করেছে।

রণথম্বোর দুর্গের বিজয়ী বীরকে সে পুরস্কার দেবে মরিয়মের উচ্ছিষ্ট যৌবন। হাঃ হাঃ হাঃ। কে যেন রিজিয়ার অন্তরের ভেতরে অট্টহাসি হেসে উঠলো।

বাঁদী এসে জানালো মরিয়মের জ্ঞান ফিরে এসেছে। রিজিয়া স্খলিতপদে গিয়ে মরিয়মের সামনে দাঁড়ালো অপরাধিনীর বেশে। রিজিয়ার কোন কথাই মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করতে হল না। সে চোখের জলের সাথে বলে গেল গত ক'রাত্রে বিশ্রী ভয়ঙ্কর কলঙ্কিত জীবনের কাহিনী।

ওরা জানত নসরুদ্দীন দিল্লীতে নেই। ওরা সেই সুযোগ গ্রহণ করেছে। খুসক্-ফিরোজী প্রাসাদের বাঁদীমহল থেকে অতর্কিতে রাত্রিবেলা প্রবেশ করে কালো কাপড়ের ঢাকনা দিয়ে তাকে জড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। যখন তার কালো কাপড়ের ঢাকনা সরানো হয়েছে সে দেখেছে সে দাঁড়িয়ে আছে বহরামের রঙমহলের অত্যুজ্জ্বল আলোর সামনে। তারপর আর তার কিছু বলার নেই। উন্মত্ত সরাবপায়ীরা তার কোন অজুহাতই শুনতে চায় নি। একযোগে কয়েকজন মাতাল তাকে আক্রমণ করেছে। তার ইজ্জত ছিনিয়ে নিয়েছে। তাকে সবার সামনে লজ্জাহীন করে তার রমণী-ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়েছে। রক্তের বন্যা রঙমহলের রঙীন ঔজ্জ্বল্যে আরও রঙের

ছোপ পরিয়েছে। সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। তারপর ক'রাত সেখানে কেটেছে সে জানে না। যখনই জ্ঞান হয়েছে সে সুলতানাকে খুঁজেছে।

সুলতানা আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে মরিয়মের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। মরিয়ম কাঁদছে। মরিয়মের ব্যর্থ জীবনের কান্নায় বাঁদী মহলের পাষাণ অলিন্দ কেঁপে কেঁপে উঠছে। সুলতানাকে অপরাধিনী বলার স্পর্ধা তার নেই। কিন্তু রিজিয়া জানে, নীরব প্রাসাদের পাষাণ প্রাচীর আজ চীৎকার করে বলছে—'তুমি দোষী। একটি বেগুণা মাসুম লেডকীর স্বপ্নকে ছিঁড়ে নেওয়ার জন্যে রাজ্যের অধিশ্বরীই দায়ী। তার পরিচালনায় গলদ থাকার জন্যে একটি রমণীর জীবন নষ্ট হয়ে গেল।'

মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে রিজিয়া নিজের মহলে ছটফট করে ঘুরতে লাগল। রাজদণ্ডের ক্ষমতার ব্যর্থতা তাকে যেন সিংহাসনচ্যুত করল। সে যেন অসহায়া হয়ে পড়ল। তার হৃদয়ের শোণিতে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তার দাহ যেন বড় দুর্বল মনে হল। দাহশক্তি থাকা সত্ত্বেও সে কাউকে দগ্ধ করতে পারে না। সে যোদ্ধা। সে অশ্বারূঢ় হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বামহাতে অসি নিয়ে বীরশ্রেষ্ঠ শত্রুকে ধরাশায়ী করতে পারে। এসব যেন তার জীবনের গল্প। সে তুর্কী রমণী নয়। সে কোমল স্বভাবা হিন্দুরমণী। রাজ্য পরিচালনা না করে কারুর ঘরের শয্যাসঙ্গিনী হলেই তাকে মানাতো ভাল।

রাজপ্রাসাদ, খুসক্‌ফিরোজী প্রাসাদ, মহলের পর মহল চারিদিকে যখন রিজিয়ার মন ঘুরে বেডাচ্ছে, গুপ্ত-ঘাতকের সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েকটিকে নিষ্ঠুরভাবে বধ করবে কিনা চিন্তা করছে, সেইসময় রণথম্বোর দুর্গের বিজয়ীদের দিল্লী ফেরার সংবাদ দূত-মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল।

রণথম্বোর দুর্গ। আলতামাস এই দুর্গ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আইবকের মৃত্যুর পর হিন্দুবা পুনরায় এই দুর্গ অধিকার করলে আলতামাস নিজের বাহুবলে হিন্দুদের পরাজিত করে রণথম্বোর দুর্গ নিজের অধিকারে আনেন। এবং নিজের শাসনাধীনে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লী রাজ্যের অধিকারভুক্ত করেন।

সেই রণথম্বোর দুর্গ রিজিয়ার রাজত্বে তার শাসনকতার মৃত্যুতে আবার হিন্দুদের অধিকৃত হয়। এই দুর্গ বার বার হিন্দুদের দ্বারা পুনরুদ্ধার ও মুসলমান সুলতানদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার কাহিনী ইতিহাসে সাক্ষ্য দিচ্ছে। হিন্দুরা রণথম্বোর দুর্গের অধিকার হারিয়েও কোনসময় ক্ষান্ত হয়ে চুপ করে বসে থাকে নি। তুর্কী সুলতান কর্তৃক বার বার অধিকারভুক্ত হলেও সুযোগ বুঝে বার বার হিন্দুরা দুর্গ দখলের জন্ম অভিযান করেছে। সেইজন্মে ইতিহাসে তুর্কী সুলতানদের সঙ্গে একাধিকবার হিন্দুদের এই রণথম্বোর দুর্গ নিয়েই সংঘর্ষ।

রিজিয়া ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে, পিতা আলতামাস এই রণথম্বোর দুর্গের জন্তই একাধিকবার হিন্দুদের আক্রমণ করেছিলেন। হিন্দুদের ওপর তার কোন জাতিগত আক্রোশ ছিল না। হিন্দুদের তিনি শিল্পনৈপুণ্যের জন্ত যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত প্রচেষ্টায় শিল্পচাতুর্যের অপূর্ব সৃষ্টি—কুতুবমীনার। তিনি

মুসলমানের শিল্পনৈপুণ্যকে যেমন সম্মান দিতেন হিন্দুদেরও তেমনি। তার প্রমাণ, আলতামাসের গম্বুজহীন কবরে জিওমেট্রিক ডিজাইনের ছড়াছড়ি। যা এখনও দিল্লীর ভূমিতে চিরঅক্ষয় হয়ে আছে। তার সৃষ্টি শুধু মুসলমানের কৃতিত্ব নয়। আলতামাস গুণী ছিলেন বলে গুণের কদর জানতেন। সেইজন্যে হিন্দুদের এই সব ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। বাংলাদেশের শাসনকর্তার দায়িত্বপদ সেইজন্যে তিনি তাঁর প্রথমপুত্র মাহমুদকে দিয়েছিলেন। মাহমুদ এই বাংলাদেশেই একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। রাজা-কামরূপের নিকট পরাজিত হয়ে তাকে জীবন হারাতে হয়। আলতামাসের একপুত্রের প্রাণ এই বাংলাদেশের মাটিতেই চিরঘুমের কোলে শেষদীপ জ্বেলেছে।

রিজিয়া এ সবই জানত। পিতা আলতামাসের মত সেও হিন্দুদের সর্বদা প্রীতির চোখে দেখত। হিন্দুজাতির বুদ্ধিমত্তার ওপর তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। হিন্দুরমণী সংযুক্তার প্রেমে সে মুগ্ধ হয়ে আজও সময় পেলে ভাবে তার কথা। হিন্দুরমণীর প্রেমের নিদর্শন নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করার জন্যে তার প্রয়াস কম ছিল না।

শম্স-উদ্দীনের মৃত্যুর পর আবার হৈ হৈ করে হিন্দুরা মুসলমান সৈন্যদের বন্দী করে, বধ করে দুর্গ দখল করে নেয়। এবং তারা বন্দী মুসলমানের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে নিজেদের নৃশংসতা প্রমাণ করে। রিজিয়া শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মুসলমানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের সংবাদ শুনে তার মানবিক মন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কোরা-আন শরিফের স্রষ্টা মহম্মদের কথা স্মরণ করে তার সুলতানা প্রাণ নির্যাতিত মানুষের জন্য কেঁদে ওঠে।

রিজিয়া নতুন সেনাপতি মালিক কুতুবউদ্দীন হসনঘোরিকে আদেশ দিল। তার ওপর সুলতানার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। তাকে ডেকে আদেশ দিল, রণথম্বোর দুর্গ অবরোধ করে মুসলমানদের যেন মুক্ত করা হয় এবং প্রয়োজন হলে এই দুর্গ ধ্বংস করে হিন্দুদের শাস্তি দেওয়া হয়। সঙ্গে কয়েক সহস্র অশ্বারোহী সশস্ত্র সৈন্য ও সুযোগ্য সেনাধ্যক্ষ নসরুদ্দীন গেল।

খবর অনেক আগেই দিল্লীতে পৌচেছিল। হসনঘোরি রণথম্বোর দুর্গ ধ্বংস করে ফিরছে। সঙ্গে বন্দী মুসলমানরা ও বহু হতাহত সৈন্যের মিছিল। রিজিয়া নতুন সেনাপতির বিজয়োল্লাসকে উৎসাহিত করবার জন্যে, দিল্লী সুলতানার ক্ষমতাকে প্রচারিত করবার জন্যে উৎসবের আয়োজনে রাজপ্রাসাদের চারিদিক ভরিয়ে তোলার আদেশ দিল। কুতুবউদ্দীন তার দাদুর নাম ছিল। দাসবংশের প্রথম ক্রীতদাস ছিল এই দাদু। সেই দাদুর নামে নতুন সেনাপতির নাম। কুতুবউদ্দীন হসনঘোরি একজন শক্তিমান পুরুষ, সেনাপতি হবার যোগ্য। আইবক বহতু মারা যাবার পর এই হসনঘোরিকে দেখে একবাক্যে সে সেনাপতি নির্বাচন করেছিল।

সে আজ বিজয় অভিযানে দিল্লীতে ফিরছে। রিজিয়া তাকে বরণ করবার জন্য সবরকম রাজসিক আদেশ প্রদান করল। কিন্তু নসরুদ্দীনের জন্য তার মনের তলায় দারুণ লজ্জাবোধ লুকিয়ে রইল। সে যখন সামনে এসে দাঁড়াবে! তার কৃতিত্বের পুরস্কার যখন সে সুলতানার কাছে চাইবে তখন সে কি দেবে?

মরিয়ম সুস্থ হয়েছে কিন্তু কেমন যেন পাগলের মত দিনরাত কান্না-হাসির মাঝে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া আতঙ্ক নিয়ে থর থর করে কাঁপছে। তার অবস্থা দেখে রিজিয়ার মন আরও নীচুগামী হয়ে পড়েছে। আরও সে ভাবছে নসরুদ্দীন যখন মরিয়মের অবস্থার কথা জানবে তখন সে সুলতানাকে কি মনে করবে? নসরুদ্দীনের জন্যে মনে একটা বিরাট আতঙ্ক নিয়ে রিজিয়া আশা করতে লাগল বিজয়ী সৈন্যদের দিল্লীতে ফেরার।

বিজয়ী সেনাপতি ও তার সৈন্যরা দিল্লী প্রাসাদে ফিরল। উৎসবের রোশনাই জ্বললো প্রাসাদের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে। প্রাসাদের তোরণদ্বারে নহবত চূড়ায় নহবতের বাদ্য বেজে উঠল। সুলতানা রিজিয়ার জয় ঘোষিত হল দিল্লী নগরের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে। সুলতানা রিজিয়া সিংহাসনে বসে হাসিমুখে বিজয়ী সেনাদের অভিবাদন জানালেন। সেনাপতি হসনঘোরিকে জানালেন অন্তরের শুভেচ্ছা। সামনে নসরুদ্দীন। মরিয়মের আত্মা। রিজিয়া তাকে দেখে মুহূর্তে কেঁপে উঠল। কিন্তু সংযম রক্ষা করল। পরে নসরুদ্দীনকে তার কৃতিত্বের জন্য উচ্চপদে উন্নীত করবার প্রতিশ্রুতি দিল। এসব যা কিছু করলো রিজিয়া স্বপ্নের ঘোরে।

তারপর থেকে রিজিয়া নসরুদ্দীনের আড়ালে আড়ালে নিজেকে সরিয়ে রাখল। নসরুদ্দীন জানতে যখন পারল মরিয়মের কথা তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্ষিপ্ত হয়ে সে সেনা-প্রাসাদের অলিন্দে ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে ছটফট করে ঘুরতে লাগল। বিস্ময়ে ভাবতে লাগল, সুলতানা রিজিয়ার প্রহরাধীনে খাস প্রাসাদের বাঁদীমহল থেকে কি করে মরিয়ম অদৃশ্য হয়! কিন্তু নসরুদ্দীন শুধু হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাসই ফেলল, বীর তার বীরত্বের আবেগে মরিয়মের লাঞ্ছিত জীবনের কথা সুলতানাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারল না। কারণ তার অধিকার কি? সে কোন অধিকারে মরিয়ম-পতনের কৈফিয়ৎ তলব করতে যাবে! তার যদি শাদী করা বেগম হত তাহলে সে তার স্ত্রীলোকের জন্য সুলতানার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাইতে পারত।

কিন্তু নসরুদ্দীন কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না। আপন হৃদয়ের মাধুরীতে দুর্ভাগ্যের ছোঁয়াচ পরিয়ে সে বীর মনের পৌরুষকে ছুরি দিয়ে বধ করে দিল। ছেড়ে দিল রাজপোষাক। ছেড়ে দিল উচ্চপদ। ছেড়ে দিল সেনাপ্রাসাদ। নসরুদ্দীন দিল্লী নগরের পথে পথে সেই কুসুম মেয়েটিকে খুঁজতে লাগল যাকে সে রণথম্বোর দুর্গ দখল করতে যাবার সময় সুলতানার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল। দরবেশের মত পোষাক পরে, পাগলের মত রূপ নিয়ে মসজিদের প্রাঙ্গনে তার বসবাস শুরু হলো।

রিজিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে সবই দেখল। লোকমুখে নসরুদ্দীনের পরিবর্তনের কথা সবই জানল। জানল, শুনল আর কাঁদল। নিজেকে ধিক্‌কৃত করল। বাঁদী মহলে মরিয়মকে বদ্ধ ঘরের মধ্যে ধরে রাখতে হয়েছে। কড়া প্রহরাধীনে তাকে মৃত্যুর কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হয়েছে। সে পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু মরবার জন্যে সর্বদা মারণাস্ত্র খুঁজছে। বিষ খেয়ে জীবনাহুতি দেবে বলে বিষ খুঁজছে।

এক একসময় রিজিয়া ভাবে: মরিয়মের মৃত্যু হওয়াই এখন উচিত। মরে গেলে সে শাস্তি পাবে। তরবারীর এককোপে শেষ করে দেবার আদেশ দিলে রাজ্যের লোক তার নৃশংসতা নিয়ে আলোচনা করবে। কঠোর মনের বিচার করবে। হয়ত অনেক দুর্ণাম দেবে। তা দিক। তবু মরিয়ম শাস্তি পাবে। সে শাস্তি পাবে। দিল্লীর আকাশ-বাতাস থেকে একটি রমণীর ইজ্জতহারার দীর্ঘশ্বাস চিরতরে লুপ্ত হবে। একটি মহব্বতের রক্তগোলাপ ফুটতে না ফুটতে ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে দিল্লীর ফকির-ধূলায় ছড়িয়ে গেল। তার স্মৃতি লুপ্ত হবে।

কিন্তু না। মরিয়ম বেঁচেই থাক্। সে শৃঙ্খলিত হয়ে বদ্ধঘরের মধ্যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বেঁচে থেকে সমস্ত রমণীকে জানিয়ে যাক—রমণীর ইজ্জত একবার লুণ্ঠিত হলে তাকে আর খোদার কাজে লাগে না। সে নষ্টা হয়ে পৃথিবীর ঘৃণ্য হয়ে যায়। মরিয়মের সব ছিল। রূপ, যৌবন, সব। কিন্তু অতর্কিতে এক দস্যু এসে তাকে অপহরণ করে নিয়ে কেড়ে নিল তার রমণী-সম্পদ।

রিজিয়া তারপর থেকে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মত কর্তব্য ছাড়া, রাজকার্য ছাড়া তার আর কোন চেতনা নেই। সে নিরলস। আড়ম্বরহীন। ইয়াকুত পাশে আছে। ইয়াকুতের জন্মে যে প্রাণের মধ্যে উন্মাদনা ছিল, আবেগ ছিল, আনন্দ ছিল, রমণী-মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল সব যেন স্তিমিত হয়ে গেল। কেউ অবশ্য কিছু জিজ্ঞাসা করল না কিন্তু অনেকেই সুলতানার ভাবান্তর দেখে শঙ্কিত হল।

যেন আত্মীয় বিয়োগ হয়েছে সুলতানার। রিজিয়ার অতি আপনজন কেউ মরে গেছে তার জন্মে সে শোকে মুহ্যমান। আড়ম্বরহীন সাধারণ বেশভূষায় সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতি। রাজদরবারে বসে কোন কঠোর বিচার না। অথচ সুসংযত। কোন সময় ভয়ঙ্কর, আবার মৃদু।

রিজিয়া তাকায় না তার সভাসদদের দিকে। আমীর-ওমরাহ মালিকরা ষড়যন্ত্র করছে সে জানে। রাজ্যের মধ্যে অনেক গোপন পরামর্শ চলছে তার বিশ্বস্ত গুপ্তচর জানিয়ে গেছে। এমন কি রিজিয়া জানে তারা কারা? গুপ্তচর প্রতিটি নাম তাকে বলে দিয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে সে প্রতিটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে রাজ্যে একটা ভয়ঙ্কর ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু না, এখন কিছু না। রাজ্য পরিচালনায় হঠাৎ কোন অসংযত ব্যবহার করা সুলতানার উচিত নয়। অপেক্ষা করতে হবে এবং একটি একটি করে আগাছাকে নির্মূল করতে হবে।

কিন্তু এরপর আভ্যন্তরীণ বিষয়ে চিন্তা করার আর কোন ফুরসৎ রিজিয়ার থাকল না। দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত এসে সুলতানাকে দুঃসংবাদ জানিয়ে গেল—লাহোরের শাসনকর্তা মালিক ইজ্জ্-উদ্দীন কবীর খান্-ই আয়াজ বিদ্রোহী হয়েছে। বিদ্রোহের কারণ ইয়াকুত। আয়াজ ইয়াকুতের প্রতি ঈর্ষান্বিত। এক বিদেশী মুসাফের দিল্লী সুলতানার প্রিয়পাত্র হয়েছে বলে আয়াজ নিজেকে ভীষণ অপমানিত বোধ করেছে।

কথাটা রিজিয়ার কানে গেলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সিংহীর মত কেশর ফুলিয়ে সে উত্তেজনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। এতদিন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য মনের মধ্যে যে বাষ্প জমে উঠছিল, সেই বাষ্প যেন সর্বক্ষমতা নিয়ে বাইরে উদ্গীরণ করল। সেনাপতি হুসনঘোরিকে আদেশ দিল—সৈন্য সাজাও। অশ্বপাল ইয়াকুতকে আদেশ দিল—খুব তেজিয়ান অশ্বের সম্মিলিত মিছিল সৈন্য-সমাবেশে লাহোরের শাসনকর্তা আয়াজকে শায়েস্তা করবার অভিযানের আয়োজন কর। উজীরপ্রবর মন্ত্রী খাজা মুহজ্জবকে জানাল—কিছুকালের জন্য দিল্লী-রাজ্যের ভার তার ওপর দিয়ে সে যাবে বিদ্রোহীদের দমন করতে। মন্ত্রী যদি বেইমানী করবার চেষ্টা করে তাহলে তার শাস্তি সুলতানা রিজিয়ার কোমল প্রাণের ক্ষমা নয়, রাজ্য পরিচালনার কঠোর বিচার মন্ত্রীর ওপর আরোপিত হবে।

রিজিয়া যখন চারিদিকে এই সবে ব্যস্ত—তখন আবার সংবাদ ছুটে এল যে, গোয়ালিয়র শাসনকর্তা বসিদউদ্দীনকে নিহত করে জিয়াউদ্দীন জুনাইদি গোয়ালিয়র অধিকার করে স্বাধীন সুলতান বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু বরণের শাসনকর্তা ঐতিহাসিক মিনহাজ-উদ্দীন-সিরাজ ও জুনাইদিকে গোয়ালিয়র ত্যাগ করে যেতে অনুরোধ করেছে। মিনহাজ রিজিয়াকে ভাল করেই জানত, একবার রিজিয়ার কাছে অপদস্থ হয়ে তার শিক্ষা হয়ে গেছে বলে সে বরণের শাসনকর্তার আদেশ শুনে গোয়ালিয়র ত্যাগ করল কিন্তু জুনাইদি গোয়ালিয়র ত্যাগ না করে বরং আয়াজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে দিল্লী আক্রমণ করবার তোড়জোড় করতে লাগল।

রিজিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে জুনাইদিকে কুকুর দিয়ে খাওয়ানোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। বিস্ময়ে সে শুধু এই কথাটাই ভাবতে লাগল—ওরা ভাবে কি? সুলতানা রিজিয়া কি মরে গেছে? সুলতানা রিজিয়ার কি ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার হাতে কি তরবারী ধরবার শক্তি নেই।

যখন বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে যাবার সব আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, এইসময় কর্তব্যবোধে ইয়াকুত, রিজিয়ার পার্শ্বচর এসে রিজিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করে জানাল: সুলতানা আমার একটি আর্জি আছে। যদি গোস্তাখি মাফ করেন তাহলে উচ্চারণ করতে পারি।

রিজিয়া মৃদু হাসল ইয়াকুতের নতমুখের দিকে তাকিয়ে, তারপর সুমিষ্টস্বরে কৌতুক করে বলল—তুমি কি অভিযানে সঙ্গী হতে পারবে না বলে মাফ চাইতে এসেছ?

ইয়াকুত সেইরকম মাথা নত করেই উত্তর দিল—না, সুলতানা। সে ধরনের কোন অভিপ্রায় জানানোর মতলব আমার নেই। আমার ভয় সুলতানার সিংহাসনের জন্যে। সিংহাসন অরক্ষিত রেখে এসময় দিল্লী ত্যাগ করা সুলতানার পক্ষে সমীচীন হবে কি না—আমি শুধু সেই কথাই ভাবছি। কারণ রাজ্যের চতুর্দিকে প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে গোপনে যে শলা-পরামর্শ কানে এসে বিঁধছে তাতে ভয় লাগে হয়ত সুলতানা দিল্লী ত্যাগ করলেই সেই ষড়যন্ত্রকারীরা এসে সিংহাসন অধিকার করবে।

মুহূর্তে ইয়াকুতের জন্য রিজিয়ার মনের কোণে একটি আসন তৈরী হয়ে গেল। ইয়াকুতকে নিয়ে তার ভাল লাগার রং যেন আরও গাঢ় আকার ধারণ করল। এমন করে রিজিয়ার জন্যে কে ভাবে? রিজিয়ার কে আছে? পিতামাতা বহুকাল গত। আত্মীয়স্বজন সিংহাসনের জন্য শত্রু। এখন সে সম্পূর্ণ একা। কেউ নেই। সান্ত্বনা তার নিজের অর্জিত সম্পদ। সেখানে ইয়াকুতের এই চিন্তা তার চোখে জল এনে দিল। কিন্তু সে তা সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বলল—ইয়াকুত, তোমার এই চিন্তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। সুলতানা রিজিয়া রাজ্যপরিচালনার কৌশলগুলি পিতা জীবিত থাকতেই পিতার কাছ থেকে আয়ত্ব করেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, আমি না থাকলে মন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। যদি করে তার পিছনে আরও একটি ক্ষমতা প্রহরাধীনে রেখে যাচ্ছি।

রিজিয়া বিদ্রোহী দমনের জন্য প্রথমেই তার বাহিনী নিয়ে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করল। বর্ম পরিধান করে, মাথায় শিরস্ত্রাণ দিয়ে, ঢাল, তলোয়ার সঙ্গে করে অশ্বারোহী সেই রিজিয়াকে বাহিনীর আগে আগে ছুটতে দেখে কিছুতেই মনে হয় না এই রমণীটি একদিন গভীর রাত্রে চাঁদের রোশনাই দেখতে যমুনাতীরে ছুটে গিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মত উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। বরং পুরুষের চেয়ে কঠিন ও ভয়ঙ্কর তেজী বলে মনে হয়। তার হাতে তরবারী। সে তরবারী মানুষের শোণিত দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। লাখো মাসুম লেড়কী অপরূপ যৌবনের উদ্দামতা নিয়ে যে রমণী রাজ্য পরিচালনা করে তার বর্তমানের রূপ দেখে ইয়াকুত বিস্ময়ে ভাবতে লাগল—এমন রমণীর দর্শন বুঝি তামাম পৃথিবীর কোথাও নেই। আরও একটা কথা মনে পড়ে ইয়াকুতের—রিজিয়া বলেছিল, তুমি ইয়া পাশে থাকলে আমি আরও শক্তি পাই। তাই কি রিজিয়া আরও শক্তি পেয়েছে?

রিজিয়া এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন লাহোরের দিকে। অশ্বের ধাবমান গতি তার বাতাসের মত দ্রুত। অশ্বের পায়ের শব্দে মাটির বক্ষ থর থর করে কাঁপছে, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। ধূলো উড়ছে। ধূলোয় ধূলোয় দিনের স্বচ্ছ আলো ধোয়ার কুণ্ডলী নিয়ে আকাশ অন্ধকার করে তুলছে। অশ্ব ক্লান্ত, সৈন্যরা ক্লান্ত, সেনাপতি ক্লান্ত, ইয়াকুত ক্লান্ত কিন্তু দিল্লীর সুলতানা রিজিরা ক্লান্ত না। তার রক্তে এগিয়ে যাবার নেশা। উন্মাদনা। উন্মাদ হয়ে উঠেছে রিজিয়া। সে যে রমণী, সে তা ভুলে গেছে। তার যে দেহে আজ বিজলী। তাকে যে লোকে শয্যাসঙ্গিনী করবার জন্যে কামনা করে। সে যে লাখো নওজোয়ানের হৃদয়ের পিয়াস—সেকথা সে একেবারে বিস্মৃত হয়েছে। সে যোদ্ধা, সে বীর, সে তরবারী হাতে রণক্ষেত্রে শত্রুনিধন করে সিংহাসনের সম্মান রাখতে পারে—এইটুকু ছাড়া মনে হয় সে সবই ভুলেছে।

হসনঘোরি চমকিত হয়, ইয়াকুত বিস্মিত হয়—রিজিয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে। তারা মনে মনে স্বীকার করে—সত্যিকারের কেউ যদি দিল্লীর তখ্‌তে বসে থাকে সে সে হল সুলতানা রিজিয়া। জগতে এর কীর্তি চির জাগরূক হয়ে থাকবে। মনে মনে তারা দুজন বীরই শ্রদ্ধা জানায় সেই লাহোর পথাভিমুখী এক তুর্কী রমণীর বীরত্বকে।



একদিন অনেক রাত্রে।

কোন একটি উন্মুক্ত মাঠের ওপর তাঁবু পড়েছে। সংখ্যাতীত তাঁবুর মধ্যে রাতের নিশুতি নেমে এসেছে। সৈন্যরা পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গভীর ঘুমে তাঁবুর মধ্যে আচ্ছন্ন চাঁদের আলো এসে রূপোলী চাদর বিছিয়েছে তাঁবুব মাথার ওপর। সাদা সাদা সাগরের ফেনার মত তাঁবুর মাথায় চাঁদের আলো। যেন দর্পণে আলো পড়ে আলো বিকীরণ করেছে চতুর্দিকে।

রিজিয়া ঘুমতে পারেনি তাঁবুতে। পাশের তাঁবু থেকে ইয়াকুতকে ডেকে এনে উন্মুক্ত মাঠের একধারে ঘাসের ওপর ঘাস শিশু হযে বসে পড়েছে। আজ বড বেশী এইরাতে ইস্কান্দারকে মনে পডছে। ইস্কান্দার যেন সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে যন্ত্রণার মধ্যে ক্লান্তি এনে দিচ্ছে। প্রথম যৌবনের সেই অবুঝ দিনগুলি উন্মাদনা নিয়ে এলেও সেদিন রিজিয়া সিংহাসনের স্বপ্নেই বিভোর ছিল। হৃদয়ে সেদিন অন্য কোন অনুভূতির স্পর্শ ছিল না। পিতা আলতামাসের পাশে পাশে থেকে রণকৌশল শেখা, সিংহাসনে বসে রাজ্য পরিচালনা করা, অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া, মনকে নৃশংস করে তোলা—এ ছাড়া কিছুই সেদিন মনে করবার সময় ছিল না। যদিও রমণী দেহের ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্য বাইরের কৌতূহলীকে অবাক করে দিয়েছিল, রিজিয়া তার দেহের অগ্নিতে অনেককে দগ্ধ করেছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। রিজিয়া নিজে তার কিছু জানত না। এমন কি ইস্কান্দার সেদিন দুঃসাহস নিয়ে এগিয়ে এলেও রিজিয়ার প্রবৃত্তি তাকে কুর্ণিশ জানায় নি।

আজ সে ইস্কান্দার কোথায় কে জানে? আজ মনে হয় সে সুলতানা রিজিয়ার সিংহাসনের পাশে পাশে থেকে তাকে বিদায়ী যৌবনের দিনগুলিকে রক্তাক্ত করে চলেছে। অশরীরি আত্মা নিয়ে সে রিজিয়ার অন্তরালে থেকে প্রতিশোধ নেবার জন্য রিজিয়ার প্রাণের মধ্যে পুরে দিয়েছে দুশমনের শয়তানী। রিজিয়া জানে, আজ যা সে করেছে, তাতে সিংহাসনের আশে পাশে শত্রুর সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। তারা রিজিয়ার উচ্ছৃঙ্খলতা কিছুতে ক্ষমা করবে না। রমণী হয়ে বাইরের সমাজে নিজেকে মেলে ধরে রমণীর আব্রু সে নষ্ট করেছে। বহুপুরুষের সামনে নিজেকে মেলে ধরে সে

রমণী-লজ্জাকে দূর করে দিয়েছে। তুর্কী-সমাজের লোকেরা তার এই ঔদ্ধত্যকে কিছুতে ক্ষমা করে নি। তার ওপর আজকে সে রমণী হৃদয়ের চাওয়া পাওয়ার মাঝে নিজের প্রবৃত্তিকে জয়ী করবার জন্যে স্পষ্টই ইয়াকুতকে অনুগ্রহ দেখিয়েছে।

সে জানে এ অন্যায়। সিংহাসনে বসে সুলতানা অন্যায় করলে রাজ্যের লোক সিংহাসনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সুলতানার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। সেই ষড়যন্ত্রের মাঝে পড়ে রিজিয়া আজ বুঝছে, সেদিন সে ভুলই করেছিল। রমণী যতই পুরুষের মত শক্তিধর হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অসি হাতে শত্রু নিধন করুক, তবু সে রমণী। ইস্কান্দারকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলেও রমণীর প্রবৃত্তি থেকে রিজিয়া অধিকারচ্যুত হয়নি। রিজিয়া বুঝতে পাচ্ছে ইস্কান্দার বাতাসের সাথে অন্তরালে থেকে অদৃশ্য ছায়ার মত প্রতিশোধের জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছে।

নক্ষত্র-মালিনী যামিনী, জ্যোতির্ময় নিশানাথকে বুকে নিয়ে অতীব শোভাময়ী। দূরে দূরে চতুর্দিকে আসমানের রোশনীতে দিগন্ত মোহিনীরূপে প্রতিভাসিত। সমস্ত প্রকৃতি সেই প্রোজ্জ্বল চন্দ্রালোকে সুখ-স্বপ্নে নিমজ্জিত। এ রাত্রে শুধু সুখ, কান্না না। কান্নার রাত্রি যেদিন প্রকৃতিকে কবরিত করে, সে রাত অন্ধকারের গহ্বরে নিমজ্জিত। আনন্দের ও সুখের রাত্রি প্রকৃতির হাস্যোজ্জ্বল রোশনী। এ রাত্রে প্রিয়া-মিলনের জন্যে হৃদয়ের আকর্ষণে সাড়া জাগে। ঘুম ভাঙে প্রকৃতির। মায়ার মোহে মোহিনীরূপে হৃদয়কে আকুল করে তোলে।

পাশে ইয়াকুত। বসে বসে ভাবছে রিজিয়া। মনের মধ্যে জাগছে কেমন যেন হারিয়ে যাবার নেশা। এইমুহূর্তে মনে হচ্ছে সে সুলতানা না, তার কোন কর্তব্য নেই, সে রাজ্য পরিচালনা করে না, সে সামান্য এক তুর্কীরমণী। রমণী যে মন দিয়ে দয়িতকে আপন করে, হৃদয়কে উন্মুক্ত করে তাকে মহব্বতের রোশনীতে রাঙায়—অভিসারিকা হয়—রিজিয়ার মন আজ সেই পর্যায়ে। রিজিয়া সামান্য রমণী। পাশে যে আছে সে তার অধীনস্থ কর্মচারী না। সে হৃদয়ের পূজারী, সে তার দেবতা। আল্লার প্রেরিত দূত।

সে এইমুহূর্তে ভুলে যেতে চায়—সে লাহোর আক্রমণ করে বিদ্রোহী আয়াজকে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছে। তার অভিযানে হাজার হাজার সৈন্য তার পিছনে চলেছে তারই জন্যে প্রাণবলি দিতে। সব ভুলে সে এখন এই রাত্রে সামান্য রমণী।

চোখে সুরমা কাজল। দেহে মহব্বতের আকুলতা। শোণিতে চাঞ্চল্য।

ইয়াকুত অনেকক্ষণ পাশে নিঃশব্দ হয়ে বসেছিল। সে ভয়ে ভয়ে তাঁবু ছেড়ে সুলতানার সঙ্গে এসেছে। সে বিস্ময়ে ভাবছে, সুলতানার দুঃসাহসিক হবার কথা। দিল্লী থেকে এত মাইল দূরে এই লোকালয়হীন উন্মুক্ত প্রান্তরে অসংখ্য সৈন্যদের মাঝে সুলতানার এই নির্লজ্জ রাত্রি অভিসার ক্ষমার অযোগ্য। একদিন সেই সুলতানার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে সুলতানাকে জয় করার জন্য উন্মুক্ত রাজসভায় পাণিপ্রার্থনা করেছিল, সেদিন সে জানত না সুলতানা কত অসহায়া। আজ তার সে পাণিপ্রার্থনার ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়েছে, আজ সে ভাবছে সুলতানার কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার

উপায় কি। সুলতানাকে লোকনিন্দার হাত থেকে বাঁচাতে গেলে তাকে ছেড়ে যাওয়াই উচিত। কিন্তু এই বিপদসঙ্কুল রাজ্যে সম্পূর্ণ একাকী তাকে ছেড়ে গেলে সকলে তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে পথে ছড়িয়ে দেবে। সে বুঝতে পারছে, আগামী কিছুদিনের মধ্যে সুলতানার বিরুদ্ধে বিরাট এক অভিযান বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। তার প্রথম সাক্ষী লাহোরের আয়াজ। যার জন্যে তাদের এই অভিযান। সুলতানা ক্ষিপ্ত হয়ে সেই আয়াজকে শায়েস্তা করতে চলেছে। কিন্তু আয়াজের দোষ কি? আয়াজ কেন, রাজ্যের সব লোকই সুলতানা রিজিয়ার হৃদয় অধিকার করতে চায়? রূপসী রিজিয়ার পাণিপ্রার্থনা সকলের। কারণ রিজিয়ার অনুগ্রহ পেলে শুধু রিজিয়া না সিংহাসনের একাধিপত্য সে পাবে। সেখানে এক বিদেশী মুসাফের এসে অনধিকার প্রবেশ করেছে। বিদ্রোহী হবে না কেউ?

ইয়াকুত হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, সুলতানা, একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, আমি বিদায় নিলেই মনে হয় এই বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটবে। আমাকে বিদায় করে দাও।

রিজিয়া অন্য কোন একরাজ্যে তখন বিচরণ করছিল, হঠাৎ চমকে ইয়াকুতের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বলল—কি বললে!

আমি বিদায় চাইছি সুলতানা। আমার জন্যে তোমার বিরুদ্ধে সকলের ষড়যন্ত্র ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। তাই বিদায় নিয়ে তোমাকে মুক্ত করে যেতে চাই।

বি-দা-য়! চাঁদের রূপো আলোর মাঝে একমাথা এলো চুলে মাথা ঝাঁকিয়ে হি-হি করে পাগলের মত হেসে উঠল রিজিয়া। তারপর হঠাৎ মুহূর্তে শুব্ধ হয়ে গিয়ে ভাবতে লাগল—তবে কি ইস্কান্দারের আত্মা ইয়াকুতের ওপর ভর করে তাকে শাস্তি দিতে চায়? রিজিয়া যেন কেমন ভীত হয়ে পড়ল, ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। মনে হল, প্রাণের মধ্যে বুঝি ইয়াকুতের 'বিদায়' কথাটি প্রতিধ্বনি তুলে তাকে ভেঙ্গে দিতে চায়। হঠাৎ রিজিয়া অস্ফুটস্বরে উত্তেজিত হয়ে মাথা নেড়ে বলল—না, না, না—কখনই না। তোমার জন্য যদি সিংহাসন আমাকে ছাড়তে হয়, ছাড়বো; তবু আর সে ভুল করবো না। হৃদয় ছাড়া যে সিংহাসন বড় না—তার প্রমাণ আজকে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমি পাচ্ছি। তোমার জন্যে আজ আমি সব ছাড়তে পারি, কিন্তু তোমাকে না।

রিজিয়ার আয়ত চোখদুটি দিয়ে জল ঝরতে লাগল। ইয়াকুত তাকিয়ে রইল সুলতানার কান্নারত ব্যথাতুর মুখখানির দিকে চেয়ে। একমাথা সোনালী চুলের বর্ণাঢ্য পিঠ পর্যন্ত শোভাবর্ধন করেছে। রিজিয়ার পরণে শালোয়ার, পাঞ্জাবী, বুকে পাতলা ওড়নার আস্তরণ। সিফনের মত পাতলা পোষাকের ভিতর থেকে রিজিয়ার দুধে-আলতা দেহের বর্ণাঢ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বুকের ওপর যৌবন-সমুদ্রের উত্তালতাকে চাপা দিয়েছে একখণ্ড মসলিনের কাঁচুলি। তা এই চাঁদের স্বচ্ছ রোশনীতে প্রকট হয়ে পড়েছে। বুকের স্পন্দন দ্রুত। সেইজন্যে রিজিয়ার অসমতল বুকের কাঁচুলির অভ্যন্তর চঞ্চল।

ইয়াকুত রিজিয়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবল, তবে কি স্থলতানা আজ এই রাত্রির গভীরে দিল্লী থেকে অনেক দূরে এই উন্মুক্ত প্রান্তরে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে বলেই এতদিন ধরে মনে মনে কোন গোপন-অভিসন্ধি পুষে রেখেছিল ? কিন্তু তা কি করে হয় ? রিজিয়া অসাবধানে অন্যায় করতে চাইলে সে কেন অন্যায় করতে দেবে ? সে এক সামান্য পুরুষ, আজ স্থলতানার অনুগ্রহে দিল্লীরাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কিন্তু স্থলতানার সেই অনুগ্রহ পেয়ে সে তার ওপর বেইমানী করবে ? না-না-না অসম্ভব। স্থলতানাকে বাঁচাতেই হবে। অন্ততঃ আজকের এই রাত্রে তার বিরাগভাজন হয়েও তাকে রক্ষা করতে হবে। এ কালরাত্রি অন্তরালে চলে গেলে আগামীকল্য সূর্যোদয়ে সে বুঝতে পারবে—কাল সে দোজাকের পথে দুশমনের হাত ধরে এগিয়ে চলেছিল। যদি তার স্খলন হত তাহলে কাল সূর্যোদয়ে কি সে মুখ দেখাতে পারত ?

ইয়াকুত রিজিয়ার কান্নারত ব্যথাতুর মুখখানির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—স্থলতানা, তুমি তাঁবুতে ফিরে যাও।

সর্পিনী যেন দংশন করে নিজেই যন্ত্রণায় ছটফট করে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। চীৎকার করে বলল—তুমি ভীরু, তুমি পুরুষত্বহীন, তুমি কাপুরুষ ইয়াকুত। তুমি জানো, এইমুহূর্তে আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে ঘাতকের কাছে প্রেরণ করতে পারি ?

ইয়াকুত মাথা নেড়ে বলল—জানি। জানি স্থলতানা। আমি কখনও বিস্মৃত হই নি, আমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি ! আমি স্থলতানার গোলাম। এই বলে ইয়াকুত দাঁড়িয়ে উঠে রিজিয়াকে কুর্নিশ করল।

থর থর করে কেঁপে উঠল রিজিয়ার দেহ। ইয়াকুতের মুখের দিকে হঠাৎ কাতর হয়ে তাকিয়ে তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। অস্ফুটস্বরে বলল—স্থলতানা, স্থলতানা ! সবাই আমাকে উচ্চসিংহাসনে বসিয়ে কুর্নিশ জানাতে চায় ! সবাই আমাকে আসমানের তারা ভেবে দূর থেকে অবাক চোখে দেখতে চায় ! আমি যেন পাথরের মীনারের মত সবার দৃশ্যমান হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসে আছি। বলতে পার ইয়া, আমি রক্তমাংসের মানুষ, না আমি পাথর !

রিজিয়া কাঁদছে। তার গোলাপী অধর থর থর করে কাঁপছে। তার মসৃণ রক্তাভ গাল বেয়ে অশ্রু প্লাবন জাগিয়েছে। রিজিয়ার বুকের ভিতর কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, সেখানে ঝড় উঠেছে। রিজিয়া নিজেকে শরাবপায়ী উন্মত্ত সৈন্যদের মধ্যে এক মুহূর্তে বিলিয়ে দিতে পারে। তার এতদিনের সংযম যেন গলার মত গলে গলে পড়েছে এই রাতের গভীরে। তাকে বাধা দিতে গেলে কোন সান্ত্বনাই বাধা মানবে না। কিন্তু তবু ইয়াকুত আজকে মরীয়া হয়ে চেষ্টা করবে স্থলতানাকে বাঁচাতে। স্থলতানার স্খলন যে লাখো লাখো মানুষ আওরতের স্খলন একথা কখনও বিস্মৃত হলে চলবে না। কিন্তু রিজিয়া কাঁদছে। সে কেঁদে অপরের মনের অনুগ্রহ কুড়োচ্ছে। সেখানে এইমুহূর্তে মনকে লঘু করা যে রিজিয়াকে আবার

দেওয়া—এই কথা ভেবে ইয়াকুত কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—সুলতানা, রাতের শেষপ্রহর আগত। তাঁবুতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নাও। আগামীকল্য প্রত্যূষে লাহোরে আয়াজের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। সামনে সমূহ বিপদ। আয়াজ বিদ্রোহী হয়ে তোমাকে বন্দী করবার চেষ্টা করছে। তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য তোমার অনেক শক্তি অপচয় করতে হবে। তোমার রাজ্যে শান্তি ফিরে আসুক, আমি তো সর্বদা তোমার পাশেই আছি, যদি মৃত্যু না হয় তাহলে নিশ্চয় আমি তোমাকে খুশী করবার চেষ্টা করব। অন্ততঃ আজ রাতের জন্য আমার গোস্তাকি মার্জনা করে তুমি তাঁবুতে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নাও।

রিজিয়া হঠাৎ দাঁত দিয়ে গোলাপী অধর কামড়ে ধরে উঠে দাঁড়াল। তারপর ইয়াকুতের দিকে অবাক বিস্ময়ে নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে টলতে টলতে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলো।

আয়াজ খবর পেয়েছিল রিজিয়া দিল্লী ত্যাগ করে লাহোর অভিমুখে রওনা হয়েছে। রিজিয়ার পিছনে অনেক শত্রু কিন্তু সামনে কেউ না। সামনে বড় বড় যোদ্ধারা মাথা নত করে তাকে সেলাম জানায়, শ্রদ্ধা করে, অধীন কর্মচারীর মত ব্যবহার করে। এ কথা রিজিয়াও জানে, তামাম রিজিয়া-শাসিত রাজ্যগুলির শাসনকর্তারাও ভালভাবে জানে।

রিজিয়া যখন লাহোরে পৌছলো, সঙ্গে ইয়াকুত ও হসনঘোরিকে নিয়ে—তখন আয়াজ নিজের আস্ফালনের কথা ভুলে গিয়ে সুলতানার ক্ষমাপ্রার্থী হলো। ক্ষমাপ্রার্থিজনকে ক্ষমা করাই বিধি। বিশেষ করে রিজিয়ার কোমল প্রাণ, ক্ষমাপ্রার্থীর জন্যে তার মন সর্বদাই আকুলিত ছিল, সে যত দোষই করুক। আয়াজ যে অন্যায় করেছিল তার ক্ষমা বড় একটা সুলতানরা করতেন না কিন্তু রিজিয়ার বিশেষত্ব এইখানে। সে সর্বদা অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করত যদি অপরাধী নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করত। তাছাড়া, আয়াজ বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করতে—অহেতুক রক্তক্ষয় হল না বলে, মানুষের মৃত্যু দেখতে হল না বলে সে খুশী হয়ে উঠল। আয়াজকে ক্ষমা করল বটে রিজিয়া, কিন্তু তাকে আর লাহোরে রাখল না। মুলতানে বদলি করে দিল। মুলতানের শাসনকর্তা করাকুশ খাঁকে অবিলম্বে সংবাদ পাঠিয়ে জানিয়ে দিল যে, লাহোরের সামন্তের পদ তাকে দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি অবিলম্বে মুলতান ত্যাগ করে লাহোরে চলে আসেন।

ইজ্‌উদ্দীন কবীর খানই আয়াজ সুলতানার কথামত মুলতানে প্রেরিত হল। রিজিয়ার রাজ্য-পরিচালনার নীতি সম্পূর্ণ পিতা আলতামাসের নীতি। আলতামাস

যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করে তাকে শাস্তি না দিয়ে ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন, রিজিয়াও সেইরূপ ভিন্ন ব্যবস্থা করে অপরাধীকে ক্ষমা করত।

তারপর রিজিয়া অবিলম্বে লাহোর ত্যাগ করে গোয়ালিয়রের পথে এগিয়ে গেল। তার বিজয়ী মনে যেন নব উদ্দীপনা। এত সহজে সে আয়াজকে বশে আনতে পারবে, তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তাই যখন গোয়ালিয়র-এর পথে সে এগিয়ে চলল, ভাবতে লাগল, হয়ত সেখানেও গিয়ে দেখবে জুনাইদি তার আগে গোয়ালিয়র ত্যাগ করেছে। রিজিয়া গোয়ালিয়র গিয়ে সেই কথাই শুনল। জুনাইদি রিজিয়ার আসবার আগেই সম্পূর্ণ ভীত হয়ে গোয়ালিয়র ত্যাগ করে চলে গেছে। তবে এর মধ্যে বরণের শাসনকর্তার কিছু কৃতিত্ব ছিল। রিজিয়া বরণের শাসনকর্তার কাছে দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত পাঠিয়ে দিয়ে জানাল যে, তার এই সাহায্যের জন্য সুলতানা তাকে যথাসময়েই পুরস্কৃত করবে।

রিজিয়া প্রায় বহুদিন তার শাসিত রাজ্যের চারিদিকে ঘুরে বিদ্রোহীদের দমন করে অবশেষে দিল্লীতে ফিরল। লোকক্ষয় তার কিছু হয়নি, রক্তও যায়নি একফোঁটা, শুধু রিজিয়ার উপস্থিতি বিদ্রোহীদের ভীতি উৎপাদন করেছে। রিজিয়ার যোদ্ধা-বেশ দেখে বড় বড় বীরেরা অসি ফেলে মাথা নত করে সুলতানার বশ্যতা স্বীকার করেছে। সুলতানা রিজিয়া তাই ভাবে, তার আজও ক্ষমতা আছে, বিলীন হয়নি।

আবার সেই দিল্লী। আবার সেই রাজপ্রাসাদ। এবারে মনে হল যেন দিল্লীর প্রাসাদের চারিদিকে ভয়ের একটা হিমেল স্পর্শ লেগেছে। আগের মত আর সে উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। আমীর-ওমরাহ্-মালিকরা সুলতানার অধীন হয়ে তাকে বার বার কুর্নিশ জানাল। রিজিয়া খুশী হল এদের আচরণে। বিজয়িনী রিজিয়া সিংহাসনে বসে সুলতানার গর্বে গর্বিতা হয়ে উঠল। এতগুলি রাজপুরুষ যখন তার বশ্যতা স্বীকার করেছে তখন তার সিংহাসনের আশেপাশে চিরশান্তিই বিরাজ করবে।

বাইরের বিদ্রোহের ইন্ধন যে এই দিল্লী থেকে যোগান হয়েছিল, তা রিজিয়া জানত। বাইরের বিদ্রোহ দমন হতে ভিতরের শত্রুরা যে বুঝেছে খুব সুবিধে হবে না, এই ভেবেই মনে হয় তারা জাল গুটিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া ইজ্‌উদ্দীন কবীর খানই আয়াজ হঠাৎ ভয় পেয়ে বশ্যতা স্বীকার করে ফেলল দেখে দিল্লীর বিদ্রোহীরা আর মাথা তুলতে সাহস করল না। না'হলে এই আয়াজ খুব সহজ লোক ছিল না। তার মত শয়তান ব্যক্তি রিজিয়ার রাজ্যে বিরল। অথচ তাকে ক্ষমা করল কেন রিজিয়া? এটা রাজ্য-পরিচালনার একটি কৌশল। আয়াজকে নিহত করলে আভ্যন্তরিক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠত। তার চেয়ে আয়াজ ক্ষমা পেয়ে সুলতানির অনুগ্রহে বেঁচে থাকল। তাতে সকলের লজ্জা। আয়াজ যখন অধীন, তখন অন্য কারও বিদ্রোহী হওয়া লজ্জাকর।

রিজিয়ার রাজ্য পরিচালনায় পূর্ণ শান্তি ফিরে আসতে সে আগের মত আবার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তৎপর হল। কিন্তু তবু শান্তি কোথায়? মরিয়ম বাঁদীমহলে উন্মাদিনী। হাতে-পায়ে তাকে শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করে ঘরে বন্দী করে রাখতে হয়েছে।

তার অসামান্য যৌবনের এক কণাও আর অবশিষ্ট নেই। গোলাপীবর্ণ দেহ নীলাকার ধারণ করেছে। বুকের সেই কৌস্তুভরত্নে আর সে উত্তালতা নেই। নেই কোন উন্মাদনা। সম্পূর্ণ নিস্তেজ ও স্তিমিত। সমুদ্র সফেন যৌবনের উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে সম্পূর্ণ শান্ত প্রবাহিত। মরিয়মকে দেখে রিজিয়া যেন চাবুকের আঘাত খেল। তার মনে কত স্বপ্নের প্রেমাস্পদের আলিঙ্গনের আশা ছিল। সে আশা অন্তর্হিত। কিন্তু দুটি জীবন চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল। নসরুদ্দীন আজ কোথায়—কে জানে? দিল্লীতে যে নেই তার খবর রিজিয়া দিল্লীতে ফিরেই নিয়েছিল।

মরিয়ম-নসরুদ্দীনের কথা মনে হলে সুলতানা নিজেকে অপমানিত মনে করে। মরিয়মের ইজ্জত খোয়া যায়নি, তার গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু যদি তার যেত, তাহলে বোধহয় এত যাতনা হৃদয়ে সহ্য করতে হত না। রিজিয়া বর্তমানে শুধু এই জায়গায় পরাজয় স্বীকার করেছে। বহু বাঁদী দিনের পর দিন প্রাসাদের অন্ধকারের অন্তরালে নিজের ইজ্জত বিলিয়ে দিয়ে পুরুষের কৃপা-প্রার্থিনী হচ্ছে তার জন্যে ক্ষতি না, কারণ রাজপরিবারের এইসব রাজসিক দুরারোগ না থাকলে, রাজপরিবারের ঠাট্ বজায় থাকে না। কিন্তু মরিয়মের মত মেয়েরা যারা বাঁদী হয়েও উচ্চাশা নিয়ে জন্মায় তাদের ইজ্জত কেউ হরণ করে নিলে সমস্ত রমণীকুলের অসম্মান।

এক সময় মনে হয় রিজিয়ার—এর চেয়ে বুঝি সামান্য ফকিরের ঘরে জন্ম নিলে ভাল হত। অন্ততঃ হাজারো হাজারো সমস্যা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারত। একটি ছোট্ট ঘরের ক্ষুদ্র-বৃত্তে জীবনের স্বপ্নকে ছোট্ট করে দেখলেও মনে আনন্দ ছিল। তার মধ্যে একাকীত্ব ছিল। একাত্ম ভাব জেগে থাকত। আন্তরিকতায় পূর্ণ হত। রাজা-উজীরের ঠাট্ নিয়ে অহেতুক সম্মানকে বজায় রাখতে গিয়ে আকুল হতে হতো না।

রিজিয়া আবার ছটফট করতে লাগল। আবার তার মনের শক্তি নষ্ট হয়ে গেল। সারাদিন ধরে রাজকার্য করে রাত্রিবেলা সে বিশ্রাম নিতে পারে না। আসমানের অন্ধকার.রোশনী তাকে যেন আরও অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে দেবার চেষ্টা করে। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। মনে হয় যেন কবরের আত্মারা প্রেতাত্মার রূপ নিয়ে সিংহাসনের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। নেই, নেই, পরিত্রাণ নেই। অন্ধকারে দিল্লী-প্রাসাদের চারিদিকে যেন কারা এসে দাঁড়িয়ে তাকে শাসিয়ে যাচ্ছে।

সেই ফকির আজও গান গাইছে।

'বর্ দর্-ই সুলতান্-ই আসর্ হএক নাদারম্ কসে।

তা কে রসানদ্ বআর্জ-ই মকসম্-আর্কানে-উ।'

ফকির গাইছে সুলতানের দুঃখের গীত। কি দুঃখ! এই যুগের সম্রাটের দরবারে আমার কেহ (বন্ধু) নেই। যে (আমার) প্রার্থনা তাঁর শ্রুতিগোচর করবে। আল্লা নিজেই তামাম পৃথিবীর সম্রাট। সেখানে সেই সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বড়ই কষ্টকর।

আজ মনে হচ্ছে ফকির সাহেবই বুঝি সবচেয়ে সুখী। সে গান গাইতে পারে

সে গান গেয়ে মনের দুঃখ লাঘব করতে পারে। তার গানে অপরের দুঃখ লাঘব হয়ে যায়। তার চোখের জল শুকোয়। বেদনা স্তিমিত হয়।

'কাবাত উল্-ইসলাম' মসজিদের পবিত্র প্রাঙ্গনের ফকিরকে স্মরণ করল রিজিয়া। লোকটিকে অনেকদিন ধরে দেখবার সাধ আছে। কিন্তু সময়াভাবে দেখা হয়ে উঠছে না। সময়াভাবে সুলতানা খোদাকে ডাকতে পারে না। মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারে না। দেশের জন্য, দশের জন্য সুলতানার সারাদিনের সময় সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। যে আল্লাকে ডাকলে মুক্তি, সেই আল্লাকে না ডেকে সুলতানা মানুষের সুখের জন্য প্রাণপাত করে।—আর সেই মানুষ তার ওপর অবিচার করে। মানুষও সুলতানাকে ভালবাসে না, আল্লাও রুষ্ট হল। তার চেয়ে যে সবাইকে ক্ষমা করে তাকে ডাকাই উচিত। মানুষ বেইমানী করে, সে তো করে না। সেই খোদাকে প্রাণভরে ডাকার জন্য রিজিয়ার মন আকুল হয়ে উঠল। রিজিয়ার ইচ্ছে করল, এই মুহূর্তে গিয়ে সে কাবাত-উল্-ইসলামের প্রাঙ্গণে ছুটে গিয়ে খোদাকে প্রাণভরে ডাকে। ফকিরের মত হৃদয় বেদনাসিক্ত করে রাতের স্তব্ধতার মাঝে করুণ সুরে গান গেয়ে ওঠে। তাকে চোখের জলের সাথে প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে জানায়—'হে খোদা, তুমি তো সবই জান। আমি যা চাইনি আমি তাই পেয়েছি। আমার চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে দিয়ে আমাকে তোমার ভক্ত করে নাও। আমাকে পবিত্র করে দাও। আমি শান্তি চাই। কোরা-আন্ শরিফের পবিত্র বাণী আমার মরমে আর সে আকুলতা কেন জাগায় না—আমি জানি না। অন্তর্যামী, তুমি সবই তো জান। আমি কিছু চাই না যদি তোমার মেহেরবাণী পাই।'

কে জানবে দাসবংশের তুর্কীসুলতানা বেগম রিজিয়া একদিন গভীর রাত্রে এমনি করে খোদাকে ডেকেছিল। অশ্রুজলে সিক্ত করে মন নিবেদন করেছিল। তার মনের নিঃস্ব ভাব খোদাকে জানিয়ে চেয়েছিল খোদার মেহেরবাণী। দিল্লীর সুলতানা অসি হাতে অজেয় বীর। শত্রুনিধনে সেদিন তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। কিন্তু সুলতানা যে মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব—কে জানে? সকলে জানে, যে সম্পদের ওপর বসে সম্পদশালিনী, তার আর দুঃখ কি?

কিন্তু তার দুঃখ সম্পূর্ণ একটি ফকিরের দুঃখের চেয়েও দুঃখ-ভারাক্রান্ত—কে জানে? ফকিরের তবু দুঃখের শান্তি আছে, মুক্তি আছে, সে খোদার মেহেরবাণী পেয়েছে—কিন্তু সে?

মরিয়মের রমণী ইজ্জত নষ্ট হতে—সে উন্মাদিনী হয়ে যেতে রিজিয়া যেন সিংহাসন-হারা হয়ে, বা শত্রুর দ্বারা অধিকৃতা হয়ে বন্দী-জীবনের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

সে বন্দী। তার মুক্তি নেই। তার মুক্তি দিল্লীর সমস্ত লোকেরা হরণ করেছে। শান্তি নেই। কোথাও শান্তি নেই। তামাম দুনিয়ার সমস্ত শান্তি কে বা কারা হরণ করেছে।

পরদিন সন্ধ্যার মিঠে অন্ধকার দুনিয়াকে ছেয়ে ফেললে রিজিয়া এক কালো বোরখায় নিজেকে আচ্ছাদিত করে ইয়াকুতকে সঙ্গে করে 'কাবাত-উল্-ইসলামের' মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হল। 'কাবাত-উল্-ইসলাম'-এর মসজিদ ও মীনা মসজিদ পাশাপাশি। এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন কুতুবউদ্দীন ও অপরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন আলতামাস। দুটিই দিল্লীর রাজপরিবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মসজিদ। মসজিদের গম্বুজে বিচিত্র কারুকার্য, শিল্পনৈপুণ্যে জগদ্বিখ্যাত।

রিজিয়া গিয়ে নামাজের হলঘরে প্রবেশ করল। পাশে ইয়াকুত। ইয়াকুতকে নিম্নস্বরে বলল রিজিয়া—খোদাকে প্রাণভরে ডাক, আমাদের মিলন যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।

ইয়াকুত ম্লান হেসে মাথা নামাল।

রিজিয়া অনেকক্ষণ ধরে নামাজের ঘরে থেকে হাঁটু গেড়ে নামাজের ভঙ্গিতে চোখ বন্ধ করে বসে থাকল। চোখ দিয়ে তার অশ্রুর নদী বইল। খোদাকে সে কেঁদে কেঁদে তার মনের সমস্ত লুকোনো ব্যথা নিবেদন করল। উচ্চাশা থেকে তাকে সরিয়ে নেবার জন্যে প্রার্থনা জানাল। সে সুলতানা। তাই তার হৃদয়ে কোন দুঃখ থাকতে পারে না—এ কথা যারা ভাবে, তাদের ক্ষমা করতে বলল। খোদার কাছ থেকে চাইল প্রেম, প্রীতি, মায়া, মোহ। ইয়াকুতকে যেন সে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে নিজের হৃদয়ের তৃষ্ণাকে নিবৃত্তি করতে পারে—তার প্রার্থনা জানাল।

ইতিগীন-আসমানের শাদী হয়ে গেছে, তারা আলাদা মহল পেয়েছে। তাদের জীবনে মধুমাস। তারা দুটি হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়াকে সম্পূর্ণরূপে মেলাতে দুনিয়ার সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেছে। তাদের দুটি স্পন্দন, এক হয়ে স্পন্দনহীন সাম্রাজ্যে বিলীন হয়ে গেছে। মহলের দরজা বন্ধ করে দুনিয়ার সব দরজায় তালা দিয়ে তারা দুটি প্রাণ মধুমাসের স্বপ্নমন্দিরে আবেশের রঙে রাঙা হয়ে সরাব পান করে মাতাল হয়ে আছে। মাঝে মাঝে সেইজন্যে শোনা যায়, মহল থেকে ভেসে আসে ঘুঙুরের তান। গানের মিঠে খুসবু। প্রাণের পেয়ালা ভরে নারীপুরুষের মিলনে অমৃত যেন সরাবের মাতোয়ারাকেও ম্লান করে দেয়। বসোরাই গোলাপের গোলাপী রঙে চারিদিক সমাহিত। রজনীগন্ধার মিঠে সুগন্ধ ইতিগীন-আসমানের মহলের স্বর্গে রাজ্য বিস্তার করেছে।

ইত্যবসরে ইয়াকুত একদিন বহরমের রঙমহলের পাশ দিয়ে তার প্রাঙ্গণে ফিরছে, হঠাৎ বহরামের রঙমহলের পিছনের দিকে অন্ধকার অলিন্দের পাশে তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

বহরামের রঙমহলে আগের সে অত্যুজ্জ্বল আলোর রোশনাই নেই। নেই আর রমণীদের চপল হাসির কলকলানি। ঘুঙুরেরও ঐক্যতান শোনা যাচ্ছে না। কোন

রমণী তার লজ্জার ভূষণ ত্যাগ করে আমীর-ওমরাহদের খুশী করববার জন্যে অর্থোলঙ্গ হয়ে নেই। নেই আর সরাবের পেয়ালার ঠুন্ ঠুন আওয়াজ। মাতালদের অহেতুক উল্লাসও নেই। রঙমহলের হলঘরের মধ্যে ক'টি সুদৃশ্য বর্তিকায় আলো জলছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে ইতিগীন, বহরাম ও আমীর-ওমরাহ মালিক। তারা যেন চুপি চুপি কি নিয়ে আলোচনা করছে।

ইয়াকুত নিজের কানটাকে আরও তীক্ষ্ণ করে জাফরীর ভেতর দিয়ে দৃষ্টি পাঠিয়ে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করল। চা'রিদিকে একবার সভয়ে তাকিয়ে নিল ইয়াকুত— কেউ দেখছে কি না দেখবার চেষ্টা করল। যদি তাকে লুকিয়ে অনুসরণ করে তাহলে যে সমূহ বিপদ—ওরা যে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করতে পারে—এই ভেবে ইয়াকুত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কারণ মরতে তার ভয় নেই, কিন্তু এখন মরলে সুলতানাকে কিছুতে বাঁচানো যাবে না। সুলতানার বিপদে তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। সুলতানা তাকে ভালবাসে। সুলতানা নিঃসহায়া। এই ভেবে ইয়াকুত যতটা পারল নিজেকে অলিন্দের গোপনস্থানে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করল।

রঙমহল থেকে হঠাৎ ইতিগীনের উত্তেজিত কণ্ঠ ইয়াকুতের কানে গেল। ভাতিণ্ডার সামন্তরাজ ইখতিয়ারউদ্দীন আলতুনিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছে। সে একাই আসছে দ্রুতগামী অশ্বে সওয়ার হয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে। পিছনে আছে লক্ষবাহিনী সৈন্য। প্রয়োজন হলে তারা দিল্লী আক্রমণ করবে। আলতুনিয়ার লক্ষ্য দিল্লীর সিংহাসন নয়, রিজিয়া। অপরূপ সুন্দরী রিজিয়ার পাণিগ্রহণ। সিংহাসন সে অধিকার করে মালিক শ্রেষ্ঠ বহরাম শাহর হাতে অর্পণ করবে।

বহরাম তার আতর লাগানো গোঁফে হাত বুলতে বুলতে ইতিগীনের কথার প্রতিবাদ করল—কিন্তু যদি সে তার প্রতিশ্রুতি না রাখে? যদি সে সিংহাসন পেয়ে লোভাতুর হয়ে সিংহাসনে বসতে চায়! একদিকে 'রাজি' আর একদিকে সিংহাসন নিয়ে যদি দিল্লীর সমস্ত ক্ষমতা নিজে করায়ত্ত করে!

অসম্ভব! হতেই পারে না। ইতিগীন ফরাসের ওপর চপেটাঘাত করে কবুল করল—হাজিব্ আলতুনিয়া কখনও এরূপ বেইমানী করতে পারে না। সে আমার দোস্ত। তার উদ্দেশ্য শুধু সিংহাসন প্রাপ্তি নয় রিজিয়া। অপরূপ সুন্দরী রিজিয়ার জন্যে তার বহুদিন ধরে মনে বাসনা আছে। ইতিগীন এই বলে খ্যা খ্যা করে উল্লাসে হেসে উঠল।

বহরামও দৈত্যো হাসি হাসতে হাসতে বলল—দেখো যেন কূলে তরী ভিড়িয়ে সে তরী ডুবিয়ে দিও না। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে বলেই তোমার সঙ্গে আমার বহীনের শাদী দিয়েছি। দিল্লী-সিংহাসনের মায়া বড় সাংঘাতিক কি না, ও হাজারো খুবসুরত বেহেস্তর হুরীও এর কাছে কিছু লাগে না।

ইতিগীন কবুল করে কি একটা কথা বলতে গেল। কিন্তু ইয়াকুত আর দাঁড়ালো না। তার তখন দেহে উত্তেজনা। রক্তে চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে। ভাতিণ্ডার সামন্তরাজ আলতুনিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছে। সে দিল্লী অধিকার করতে

চায়। রিজিয়াকে ছিনিয়ে নিতে চায়। ষড়যন্ত্র সব ইতিগীনের দ্বারা আয়োজিত হয়েছে। ভাবা গিয়েছিল যে দিল্লীতে বুঝি আর কোন বিদ্রোহের সম্ভব নেই। আরাজ বশ্যতা স্বীকার করতে সবাই জাল গুটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, এইমাত্র তার প্রমাণ হল।

এখন উপায়!

রিজিয়ার কর্ণগোচর করতে গেলে অযথা বিলম্ব হয়ে যাবে। অথচ আলতুনিয়া হয়ত এতক্ষণে যমুনার ধার দিয়ে এগিয়ে আসছে। সে এসে এদের সঙ্গে মিলিত হলে সমূহ বিপদ। তখন একা রিজিয়াকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করা মুস্কিল হয়ে পড়বে। তার চেয়ে পথিমধ্যে আলতুনিয়াকে বাধাদান করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আলতুনিয়াকে দিল্লী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আসতে পারলে অন্ততঃ এদিকে সময় পাওয়া যাবে, তখন সুলতানার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে ব্যবস্থা করলেই সবদিকের সুবিধে।

এই ভেবে ইয়াকুত আর কালবিলম্ব না করে অশ্বশালা থেকে দ্রুতগামী অশ্বে সওয়ার হয়ে রাতের অন্ধকারে দিল্লীর প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেল। তবে যাবার সময় একজন মাত্র লোককে সচেতন করে যেতে ভুললো না, সে হলো—ওসমান খাঁ। ইয়াকুত রাজ সৈন্যবাহিনী থেকে বাছা বাছা ক'জন যোদ্ধাসেনা দিয়ে গোপনে একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করে রেখেছিল, যে সৈন্যবাহিনীর প্রতিজ্ঞা ছিল নিজের জীবনপণ করেও সুলতানাকে সবরকম বিপদ থেকে রক্ষা করবে। যদি কোনদিন রাজসেনাবাহিনী দিল্লীশ্বরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় তাহলে অন্তত বাধা দান করবে ইয়াকুতের এই সৈন্যবাহিনী। সেই সৈন্যবাহিনীর কর্তৃত্ব ছিল এই ওসমান খাঁর ওপর। যদিও ইয়াকুতই তার সব। তবু গোপনীয় বলে ইয়াকুত সবসময় এই বাহিনীকে পরিচালনা করতে পারত না। সেইজন্য ওসমান খাঁ-ই ছিল এর প্রধান। ইয়াকুত যাবার সময় ওসমান খাঁকে সংবাদ দিয়ে গেল এই বলে যে, সে আগামী কল্য প্রত্যুষে দিল্লীপ্রাসাদে না ফেরে তাহলে যেন তাকে অনুসন্ধানের জন্য একদল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়। ইয়াকুত বুঝতে পারছিল, ঝড় উঠেছে, ঝটিকা-প্রবাহ চারিদিকে তার পাখা মেলে দিয়েছে, ধ্বংসের রূপ অবশ্যম্ভাবী।

যমুনার পাশ দিয়ে নক্ষত্রবেগে এক অশ্বারোহী ছুটে চলেছে। বাতাসের চেয়েও দ্রুত তার গতিবেগ। চাঁদনী রাত নয় শুধু মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের নিষ্প্রভ দ্যুতি ধরিত্রীর বুকে আলো-ছায়ার খেলা শুরু করেছে। সেই আলোয় যমুনার জল শুধু টলমল করছে দেখা যাচ্ছে, কোন সৌন্দর্যের সৃষ্টি সেখানে নেই।

ইয়াকুত চলেছে দ্রুত কিন্তু তার মনের মধ্যে হাজারো চিন্তা। হাজারো প্রশ্নের ভীড়ে তার মন আচ্ছন্ন। আশঙ্কা। সুলতানা রিজিয়ার জন্য উদ্বিগ্ন। বিদ্রোহীরা ভিতরে ভিতরে আবার নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। এবার আলতুনিয়া তার প্রধান। আয়াজের মত এই আলতুনিয়াও একজন বীর। এর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে রিজিয়া তাকে অনুগ্রহ দেখিয়েছিল। রিজিয়া নিজে বীর। বীরকে সম্মান দেখানো বীরের কর্তব্য, ধর্ম। সেইজন্যে এই বীরকে রিজিয়া জায়গীরদার করেছে, উপাধি দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে। ভাতিণ্ডার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছে। রিজিয়ার কাছে আলতুনিয়া সবরকমে ঋণী। তার ভাগ্য ফেরার জন্যে সবসময় সে রিজিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ।

রিজিয়ার মুখে ইয়াকুত অনেকবার শুনেছে আলতুনিয়ার নাম। এবং রিজিয়ার এও বিশ্বাস ছিল যে, আলতুনিয়া কখনও বেইমানী করবে না। যখনই সুলতানার প্রয়োজন হবে তার ডাকে অন্ততঃ ভাতিণ্ডার সামন্তরাজ সাড়া দেবে।

রিজিয়া আরও বলেছিল এই আলতুনিয়ার সম্বন্ধে। ভাগ্যপীড়িত একজন যুবক ভাগ্যান্বেষণে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একদিন নগর প্রদক্ষিণ করতে করতে এই যুবকের সঙ্গে আকস্মিক তার পরিচয় হয়ে যায়। নগরবাসীর একটি গৃহে হঠাৎ কেমনভাবে আগুন লেগেছিল। সেই আগুন থেকে একটি মানব শিশুকে নিজের জীবনপণ করে এই নির্ভীক যুবক অক্ষত অবস্থায় বের করে নিয়ে আসে। রিজিয়া সেখানে উপস্থিত হয়ে, সবিশেষ অবগত হয়ে নির্ভীক যুবককে পুরস্কৃত করিতে চাইল। তখন যুবক জানাল তার দুঃখের কাহিনী। সে যাচ্ছিল রাজদরবারে যদি সুলতানার কৃপাপ্রার্থী হতে পারে এই মানসে। রিজিয়া মুহূর্তে কালবিলম্ব না করে এই নির্ভীক যুবক নওজোয়ানকে দিল্লীর পূর্বাঞ্চল বুলন্দশহরে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। এবং ভাতিণ্ডার দুর্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করল।

তাই ইয়াকুত ভাবছিল, যখন রিজিয়া শুনবে তারই অনুগ্রাহী ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন আলতুনিয়া বিদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তখন সুলতানার মুখের অবস্থা কি দাঁড়াবে? এই সেদিন রিজিয়া দুঃখ করে বলছিল, 'যাকেই অনুগ্রহ দেখিয়েছি সেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই ভয় করে, শেষপর্যন্ত তুমিও যদি বিশ্বাস হারাও তাহলে আমার বেঁচে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়বে।' ইয়াকুতের ইচ্ছা ছিল সুলতানাকে কয়েকটি কথা বলে। কিন্তু সে সুলতানাকে সম্মান করে। সুলতানা তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে বলে সে সেই সুযোগ নিয়ে সুলতানাকে অসম্মান করবে এরকম সাহস তার না হওয়াই উচিত। কিন্তু সুলতানার সেদিনের কথায় স্পষ্ট হয় সুলতানার মনের বেদনা। সুলতানা সবাইকেই বিশ্বাস করে কিন্তু যখনই আঘাত পায় তখনই ভেঙে পড়ে এইসব আবোল-তাবোল কথা বলে যায়।

ইয়াকুত তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল—অন্ততঃ দুনিয়ায় একজন ব্যক্তি বেঁচে থাকবে যে কোনদিনও লোভের বশবর্তী হয়ে সুলতানার বিশ্বাস হারাবে না।

যমুনার ধার দিয়ে বহুপথ অশ্বারোহী ইয়াকুত চলে আসবার পর হঠাৎ সে অশ্বের

বল্গা টেনে ধরে পথিমধ্যে এক বৃক্ষের তলায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক দীর্ঘ বটবৃক্ষের দেহ হাত-পা মেলে চারিদিক ভরিয়ে রেখেছে। স্থানটি সেইজন্যে ছায়া-ছায়া অন্ধকার। একটি মানুষ সেই বটবৃক্ষের আড়ালে ঘোড়া নিয়ে লুকিয়ে থাকলে বাইরের কেউ তাকে দেখতে পাবে না। ইয়াকুত ভাবল, অযথা পরিশ্রম করে এত পথ শত্রুর পিছনে ধাবিত না হয়ে একস্থানে অপেক্ষা করে থাকা সমীচীন। কারণ দিল্লীতে প্রবেশ করতে গেলে এই পথ দিয়েই তাকে যেতে হবে। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সমাধানও হয়ে গেল।

ইয়াকুত অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে বটবৃক্ষের পিছনে নিজেকে লুক্কায়িত রেখে শত্রুর প্রতীক্ষা করতে লাগল। অনন্তকাল সে প্রতীক্ষা।

সম্মুখে যমুনার প্রবহমান শান্তমূর্তি। কালো মেয়ে যেন তার যৌবনের দেহ মেলে ইয়াকুতের দিকে ব্যাকুল দুটি আঁখি মেলে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে জোনাক জ্বলছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঐক্যতান। বাতাসের হিস্ হিস্ শব্দ। নির্ঘুম ইয়াকুত দুটি চোখ মেলে কান সজাগ রেখে অশ্বের পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করতে লাগল। সামনে চলমান পথ, বহুদূর বিস্তৃত। সেই পথের সীমানায় ইয়াকুতের দুটি চোখ। রাতের প্রহর এগিয়ে চলেছে। দিল্লীর লোকালয় থেকে এইস্থান বহুদূরে। এখান থেকে দিল্লী প্রাসাদের কোন শব্দই শোনবার উপায় নেই।

ইযাকুতের শরীরে উত্তেজনা। রক্তে তার শত্রু নিধনের চাঞ্চল্য। কিন্তু মনে তার আনন্দ। কারণ সে এতদিন পরে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। যদি আলতুনিয়াকে সে হটাতে পারে তাহলে রিজিয়ার কাছে সে শ্রদ্ধা পাবে। রিজিয়া যে তাকে কৃপাদৃষ্টি দেখিয়ে ভুল করেনি তার প্রমাণ হয়ে যাবে। এ দিল্লীসাম্রাজ্য যে অরক্ষিত নয়, বিদ্রোহীরা বিদ্রোহের আগুন গোপনে জ্বালিয়ে চলেছে তাও ভালভাবে রিজিয়ার কর্ণগোচর হবে।

সম্পূর্ণ একটি ভবিষ্যৎ কল্পনা নিয়ে মনের অসমসাহসিক শক্তি জাগিয়ে ইয়াকুত বটবৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে থাকলো। দেখতে দেখতে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আকাশ অন্ধকারের কালোবর্ণ থেকে মুক্তি পেয়ে আলোর মুখ দেখল। যমুনার জলে ভোরের আলো তার স্বর্ণরঙের ঠোঁট দিয়ে চুম্বন দিল। আসমানের নক্ষত্ররা অদৃশ্য হয়ে মেঘের বুকে নীলের ছোঁয়া জাগাল।

ইয়াকুত আসমানের দিকে তাকিয়ে ধরিত্রীর বুকে চোখ মেলে সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর বিস্মিত হলো দূরে পথের দিকে তাকিয়ে আলতুনিয়া কোথায়? তবে কি যে সংবাদ গতরাত্রে শুনেছিল তা ভুল। কিন্তু তাই বা কি করে হয়! বিশেষ করে ইতিগীনের পরামর্শ। ইতিগীন কৌশলে যে জাল পেতে চলেছে, ভবিষ্যতে মনে হয় তার ইচ্ছা সে দিল্লীর সিংহাসনে বসবে। সেই ইতিগীনের আলোচনা সে স্বকর্ণে শুনেছে। ইতিগীনের কথা যদি মিথ্যে হয় তাহলে আলতুনিয়া কখনই দিল্লীতে আসতে সাহস করবে না। কারণ আলতুনিয়া ইতিগীনের ভরসাতেই আসছে।

ইয়াকুত আবার অন্যরকম করে ভাবলো—অবশ্য আলতুনিয়া মতলব পরিবর্তন করতে পারে। হয়ত নিজে একা না এসে সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লীপথে রওনা হয়েছে।

হয়ত সেও কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা করছে। পাছে দিল্লীতে একা গেলে কেউ তাকে বন্দী করে সেইজন্যেই ভীত হয়ে মতলব পরিবর্তন করেছে। কিংবা কাউকে বিশ্বাস না করে সরাসরি সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে দিল্লী আক্রমণ করে, রিজিয়াকে বন্দী করে সিংহাসন করায়ত্ত করতে চায়। শুধু রিজিয়াই যে তার কাম্য তা নয় সিংহাসনও যে সে মনে মনে চায়—সে কথা মুখে প্রকাশ না করলেও বোঝা যায়। আলতুনিয়া বোধ হয় সেই পন্থা অবলম্বন করেছে। যদি সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে দিল্লী আক্রমণ করে—তার আগে এই সংবাদ রিজিয়ার কর্ণগোচর করাই সবপ্রথম কাজ। এই ভেবে ইয়াকুত দ্রুত দিল্লীতে ফেরার মনস্থ করল। কিন্তু হঠাৎ অশ্বের পায়ের শব্দ দূর থেকে ভেসে এল। ইয়াকুত সচকিত হয়ে উঠল।

অশ্ব খুব দ্রুত আসছে। মাটিতে তার কম্পন। বাতাসে তার শব্দ। ইয়াকুত বটবৃক্ষের পাশে লুকিয়ে থেকেই দূর পথের দিকে তাকাল। দেখা যাচ্ছে একটি ছোট চলমান বিন্দু আস্তে আস্তে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ইয়াকুতের মনে আনন্দ জেগে উঠল। কটিবন্ধে খাপে পোরা তরবারীখানা হাতের মুষ্টিবন্ধনে জোরে চেপে ধরল। বুকে অদম্য সাহস নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল শত্রুর।

অশ্বের পায়ের শব্দ আবও স্পষ্টতর হলো। প্রত্যুষের আলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। যমুনার জলে পড়ল সোনার রং। পূর্বাভাসে সূর্যের রশ্মি দিগন্তে রং চড়াল। অশ্বারোহী আরও কাছে এসে পড়ল।

আরও আরও কাছে। একেবারে ইয়াকুতের বটবৃক্ষের ধারে। মুহূর্তে ইয়াকুত লুক্কায়িত স্থান থেকে বেরিয়ে এসে ধাবমান অশ্বের গতি রোধ করল। সরোষে গর্জন করে অশ্বারোহীকে বলল—কে তুমি? কোথায় যাও?

অশ্বারোহী হঠাৎ পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হতে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে খাপ থেকে তরবারী বের করে প্রত্যুত্তর দিল—তুমি কে? হঠাৎ পথিমধ্যে অযথা আমার পথ রোধ করে তুমি তোমার বিপদকেই ডেকে নিয়ে এসেছ।

ইয়াকুত মৃদু হেসে বলল, জালাউদ্দীন ইয়াকুত বিপদকে কখনও ভয় করে না। আমি কি তাহলে ভাতিণ্ডার সামন্তরাজ, রিজিয়ার অনুগ্রাহী, ইখতিয়ারউদ্দীন আলতুনিয়ার সঙ্গে কথা বলছি।

আলতুনিয়া হঠাৎ অতর্কিতে তরবারী দিয়ে ইয়াকুতকে আঘাত করে বসল। মুখে বলল—হ্যাঁ, আমিই সেই আলতুনিয়া। দিল্লী সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। তোমাকে বধ করবার জন্যেই আমার দিল্লী আগমন।

ইয়াকুত অতর্কিতে তরবারীর আঘাত পেয়ে—তার দেহের একাংশের কামিজ ভিজে রক্তে লাল হয়ে উঠল। সেও মুহূর্তে খাপ থেকে তরবারী বের করে উপর্যুপরি কয়েকবার আলতুনিয়াকে দারুণ বেগে আক্রমণ করল। কিন্তু আলতুনিয়া শক্তিমান, কৌশলী, তরবারী চালনায় সিদ্ধহস্ত। দুই বীরের মরণপণ যুদ্ধ যমুনাতটে দারুণভাবে সরগোল তুলল। শুধু দুটি তরবারীর সংঘর্ষের শব্দ। সূর্যের আলো দুটি তরবারীর ওপর পড়ে ঝক্‌মক্ করতে লাগল।

পাখিরা হঠাৎ বনান্তরাল থেকে ভয়ে ঊর্ধ্বাকাশে ছুটে পালাল। তারা অস্বাভাবিকভাবে চীৎকার করে যমুনার তটের শান্তিকে কবলিত করল।

আলতুনিয়া তরবারী চালাতে চালাতে বলল—মৃত্যুর জন্যে তৈরী হও বিদেশী খুলাকের। সুলতানা রিজিয়ার স্নেহধন্য হয়ে দুনিয়ায় কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে, আমি তা সহ্য করব না।

ইয়াকুতও দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিল—বেইমান, নিজের স্পর্ধিত ভঙ্গিকে সংযত করে নিজের প্রাণ বাঁচা। সুলতানার মন জয় করার শক্তি তোর নেই।

যমুনার জল লাল হয়ে উঠল। দুজনের দেহ ক্ষত বিক্ষত। দেহের কামিজ রক্তে ভিজে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। মৃত্যুপণ যুদ্ধ। দুজনেই দুজনকে নিহত করবার কৌশল অবলম্বন করতে লাগল। যমুনার নির্জনতটে শুধু তরবারীর ঝনঝনানি।

শিশিরসিক্ত শান্ত প্রত্যুষে সূর্যের আলোর স্নিগ্ধরূপ। সেই স্নিগ্ধরূপকে বধ করে যমুনাতটে হানাহানির খেলা শুরু হয়ে গেল। একজন বধ করতে চাইছে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য—অপরজন বধ করতে চাইছে নিজের স্বার্থের জন্য।

হঠাৎ আলতুনিয়া অতর্কিতে ইয়াকুতের বক্ষ ভেদ করে তার তরবারী চালিয়ে দিল। ইয়াকুত নিহত হয়ে অশ্ব পিঠ থেকে পিছলে পড়ে মাটিতে গড়িয়ে গেল। রক্তের নদী বয়ে গেল ইয়াকুতের দেহ থেকে। হঠাৎ দিল্লীর পথ থেকে বহু অশ্বের দ্রুত চলমান পায়ের শব্দ আলতুনিয়ার কর্ণগোচর হল। সে তখন দারুণভাবে হাঁফাচ্ছিল। অত্যধিক শক্তি ক্ষয়ে তার দেহের অবস্থা সঙ্গীন। এখন বিশ্রাম না নিয়ে পুনঃশক্তি ফিরে আসবে না। এ ছাড়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করা সমীচীন নয়। ইয়াকুত নিহত হলে সুলতানা রিজিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। হত্যাকারী আলতুনিয়াকে সে ক্ষমা করবে না এ বোঝাই যায়।

এবার একাধিক অশ্বের পায়ের শব্দ খুব কাছে অনুচ্চারিত হয়ে উঠলো। আলতুনিয়া অশ্বের মুখ ফিরিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে ওসমান খাঁ তার বাহিনী নিয়ে এসে উপস্থিত হল। নিহত রক্তাক্ত ইয়াকুতকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর অশ্বের পিঠে নিহত ইয়াকুতকে তুলে দিল্লী অভিমুখে রওনা হল।

●
●●

বাতাসে সংবাদ চারিদিকে ছুটে গেল। আমীর-ওমরাহ-মালিকরা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে ছুটে এল ইয়াকুতের মৃতদেহ দেখবার জন্যে। ইয়াকুত-এর মৃতদেহ দেখাই তাদের উদ্দেশ্য নয়, রিজিয়ার ভাবান্তর লক্ষ্য করা আসল কাজ। সুলতানা তার প্রেমাস্পদের মৃতদেহ দেখে কি করে দেখবার জন্যে অগণিত জনসমুদ্র প্রাসাদের প্রাঙ্গণ ভরিয়ে তুলল। ওসমান খাঁ গতরাত্রের সমস্ত কাহিনী সুলতানাকে আড়ালে নিয়ে

গিয়ে জানাল। ভাতিণ্ডার শাসনকর্তা আলতুনিয়াই যে এ কাজ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রিজিয়া চমকে উঠল আলতুনিয়ার কথা শুনে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না আলতুনিয়া এই কাজ করতে পারে। কিন্তু অবিশ্বাসেরও কোন কারণ নেই। গতরাত্রে ইয়াকুতের অভিযানই প্রমাণ করেছে আলতুনিয়ার বিদ্রোহ। ইয়াকুত নিজের জীবন তুচ্ছ করে সুলতানা রিজিয়াকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। তার মৃত্যু বৃহত্তর স্বার্থের জন্য। আজ দিল্লীর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, রিজিয়া জানে, ইয়াকুত সুলতানা রিজিয়াকে বিপদমুক্ত করবার জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।

রিজিয়া একদৃষ্টিতে ইয়াকুতের রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রাণের ভেতরে দারুণ এক ঝড়ের লক্ষণ। বুক ফেটে যাবে বুঝি। চোখ দুটি জ্বালা করে কান্না বেরিয়ে আসবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। আমীর-ওমরাহ, রাজন্যবর্গরা রিজিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ রিজিয়া কঠিন হয়ে উঠল। কর্তব্যের পথে অটল হয়ে উঠল। সে সুলতানা। তার কর্তব্য, তারই পার্শ্বচরের আততায়ীকে উপযুক্ত সাজা দেওয়া। সেখানে তার কোন দুর্নাম নেই। সেখানে সে সুলতানা। তার কর্মচারীকে গুপ্তহত্যার দায়ে সে হত্যাকারীকে উপযুক্ত সাজা দিতে পারে।

কিন্তু রিজিয়া যে জানতো, আলতুনিয়া খুন করেছে সেকথা প্রকাশ করল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—আলতুনিয়াকে উপযুক্ত শাস্তিরই ব্যবস্থা করতে হবে। সে বেইমান এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ যেন স্বপ্নের অগোচর ছিল। প্রকাশ্যে মন্ত্রী উজীরকে আদেশ দিল—পার্শ্বচরের হত্যাকারীর অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠিয়ে দিন। হত্যাকারীকে পেলে রাজদরবারে হাজির করবেন, তার উপযুক্ত শাস্তিরই ব্যবস্থা করবে দিল্লীর সুলতানা।

ইয়াকুতের মৃতদেহ কবরের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে রিজিয়া চলে গেল তার খাসমহলে। মহলে নিজের খাসকামরায় এসে ডিভানের ওপর ভেঙে পড়ল। রুদ্ধকান্নার অবাধ স্বাধীনতায় সে সেই ঘরের মধ্যেই নিজেকে মেলে দিল।

কে জানে? ইতিহাস কি জানে—সেদিন দিল্লীর সুলতানা একজন বিদেশী মুসাফের জালাউদ্দীন ইয়াকুতের জন্য কতখানি দুঃখ পেয়েছিল? রিজিয়া শুধু ইয়াকুতকে হারায়নি, বন্ধু হারিয়েছে, আত্মীয় হারিয়েছে, সমস্ত দুনিয়ার একটিমাত্র মানুষ যে সুলতানাকে আন্তরিকভাবে রক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিল, তাকে হারিয়েছে। নতুন করে যেন আবার রিজিয়ার মনে তার পিতামাতার শোক উদ্বেল হয়ে উঠলো।

পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে যখন ভায়েরা যুদ্ধ করছে, সেইসময়ে রিজিয়া পিতার দুঃখে মহল থেকে বাইরে বহুকাল বের হয়নি। শুধু কেঁদেছে। সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যে কোরা-আন শরিফের পৃষ্ঠাগুলি উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করেছে। বাইরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে একেলা ঘরে বহুকাল সে নিজেকে নিয়েছিল।

মা মারা যেতে পিতার সান্ত্বনায় মায়ের দুঃখ সে ভুলেছিল। তা ছাড়া পিতা—মাকেও অত্যধিক ভালবাসতেন। পিতার দুঃখের সাথে তার দুঃখ মিলে আপনা থেকে সান্ত্বনা এসে গিয়েছিল। কিন্তু পিতা মারা যেতে সে যেমন একলা হয়ে গিয়েছিল, আজ আবার ইয়াকুত নিহত হতে সে সম্পূর্ণ একলা হয়ে গেল।

পঁচিশ বছরের জীবনে যৌবনের স্তিমিত প্রবাহ। কিন্তু অনাস্বাদিত যৌবনের সেই আকাঙ্ক্ষা তাকে উদ্বেল করে দিয়েছিল ইয়াকুতের সাহায্যে। একদিন জীবনের প্রথম যৌবনে সিংহাসনের জন্য সে দিকভ্রান্ত হয়ে অস্ত্রকে আপন করেছে, হৃদয়কে না। সেদিন ইস্কান্দার যদি একটু সুযোগ পেত তাহলে তার শূন্য জীবন পূর্ণ করে তাকে আজকের স্মৃতিতে কিছু সঞ্চয় দিয়ে যেত। সেদিন ভুল করে হৃদয়ের চাহিদাকে বধ করে সিংহাসন চেয়েছিল। সিংহাসন সে পেল বটে কিন্তু হৃদয়ের আকাঙ্খা হাহাকার করে মাথা কুটে মরল। বুঝি ইস্কান্দারের অভিশাপই ইয়াকুতের হত্যার জন্যে দায়ী।

ফুলের মত নিষ্পাপ ইস্কান্দারের প্রেম সে তুচ্ছ করেছিল। তার ঐশ্বরিক মহব্বতের রোশনীকে ম্লান করে দিয়ে সে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সেদিন তার প্রতি সে এতটুকু অনুকম্পা দেখায় নি। আজ মহব্বতের আগুনে জ্বলে শেষ হয়ে গেলেও সেদিনের প্রতিশোধের জ্বালা কোথায় যাবে?

রিজিয়া, সুলতানা রিজিয়া সম্পূর্ণ দিওয়ানা হয়ে হৃদয়ের নিঃস্বতাকে ভরাট করবার জন্যে নিজের দৃষ্টির মাঝে কিছু খুঁজে ফিরতে লাগল। সান্ত্বনা নেই। শুধু আছে হাজারো রত্নসম্ভারে মোড়া একটি নিষ্প্রাণ সিংহাসন। যে সিংহাসনে বসবার জন্যে প্রতিটি মানুষ লালায়িত। রিজিয়া নিজেও একদিন লালায়িতা ছিল। কিন্তু আজ নেই। আজ সে মনে করে—তার এই বহু আকাঙ্খিতা সিংহাসনের জন্য সে সব হারিয়েছে। এই সিংহাসনে পিতা তাকে উত্তরাধিকারিণী করে গিয়েছেন। তিনি জানেন, তার কন্যার সমস্ত মহব্বত এই সিংহাসনকে কেন্দ্র করে। সেখানে অন্য কোন প্রবৃত্তির যোগ নেই। তিনি কন্যাকে অনূঢ়া থেকেই রাজ্য পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য মুখে কিছু বলেন নি তবে মনে হয় তার অভিপ্রেত তাই ছিল। বিলাসিনীর জন্য যে এই নিষ্পাপ সিংহাসন নয় সে কথা তার নির্দেশের অক্ষরে অক্ষরে। পুত্ররা উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী বলে তিনি কন্যাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী করেছিলেন। তার দূরদর্শিতা প্রশংসাযোগ্য।

কিন্তু তখন যদি একবার বুঝত রিজিয়া। এই সিংহাসনের জন্যে তাকে যা ত্যাগ করতে হবে মনুষ্য জীবনে তার মূল্য অনেক। তাহলে সে কখনই সিংহাসনের জন্য ব্যগ্র হতো না। আজ এই সিংহাসনের জন্যে তার হৃদয় হারিয়ে গেল। আল্লার কাছে সে ছোট হয়ে গেল। আল্লার অভিপ্রেত রমণীর রমণীকর্ম করা উচিত। রমণী যদি পুরুষের মত রাজ্য পরিচালনা করে তাহলে রমণীর যে সহজাত কোমল প্রবৃত্তিগুলি ঈশ্বর দিয়েছেন সেগুলি দিয়ে কি হবে? খোদার শাসন পরিচালনার ওপর টেক্কা দিয়ে সে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তার মুক্তি নেই।

তবু এ শোক তার গোপন। এ শোকের জন্য বাহ্যিক কিছু সে প্রকাশ করতে পারবে না। মনের বেদনা মনের রঙেই ম্লান হয়ে মনের ভেতরে মৃত্যুর আরাধনা করবে। বাইরে তার প্রকাশ হলেই সারা রাজ্য তাকে নিয়ে একটি কাহিনীর জাল বুনবে। সারা রাজ্য আজ মনে হয় খুশী। সুলতানা রিজিয়ার একটু আনন্দ—তাও আল্লা কেড়ে নিয়ে তাকে শাস্তি দিয়েছে তার জন্যে সমস্ত আর্যাবর্তের লোক খুশী। রিজিয়া রমণীধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে সে পুরুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। সেইজন্যে সমগ্র দাস-সাম্রাজ্যের প্রজারা সুলতানার এই ধর্মচ্যুত কার্য সমর্থন না করে মনে মনে সুলতানার উপর ক্ষুব্ধ ছিল। সুলতানার প্রতিটি পরাজয়, আর্যাবর্তের সমস্ত রমণীকুলের জয়। তারা পর্দানসীন হয়ে পর্দার বাইরে অগণিত পুরুষের সামনে নির্লজ্জ এক রমণীকে ধর্মচ্যুতা হতে দেখে বার বার অভিসম্পাত দিয়েছে। সেই রমণী সিংহাসনে অধিষ্ঠাতা হয়েও আবার রমণীধর্মকে পালন করতে চায়। রিজিয়া যেন নিজের বন্ধঘরের মধ্যে বসেই অনুভব করতে লাগল, তার প্রিয়তমের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে সমস্ত উত্তরভারত উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

কে আর রিজিয়াকে সান্ত্বনা দেবে? বাঁদীরা পরিচারিকা ছাড়া কিছু নয়। তারা আদেশ তামিল করে। রিজিয়াকে তারা কর্ত্রী হিসাবে শ্রদ্ধা করে। সেখানে তাদের আন্তরিকতা ধৃষ্টতার সামিল। তারা প্রাণের ভয়ে জড়োসড়ো। কিসে সুলতানার ক্রোধ প্রকাশ পায় তার দিকেই তাদের লক্ষ্য বেশী। সুলতানাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে দিনান্তে তারা হাজারো সেলাম জানিয়ে নিজেদের দুর্বলতার মার্জনা চায়। এক ফিরোজা একটু তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র। কিন্তু সে দুর্বল। এসময় সে ভয়ে ভয়ে কাছে আসে না। জানে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যদি অন্যায় কিছু বলে ফেলে তাহলে সুলতানার ক্ষমা পাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়বে।

তাই রিজিয়া নিজের শাস্তি নিজেই অর্জন করে নিল। নিজের রক্ত নিজেই মুছে নিয়ে নিজেই তাতে ওষুধ লেপন করল। কিন্তু মনে মনে সে ইয়াকুতের হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে শক্তি যোগাড় করতে লাগল। ওসমান খাঁকে গোপনে নিজের মহলে ডেকে নিয়ে এল। তার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করল—ইতিগীনকে পৃথিবী থেকে কি করে সরান যায়? কারণ সে জানে, আলতুনিয়াকে শাস্তি দেওয়া'র আগে ইতিগীনকে শাস্তি দেওয়া উচিত। ইতিগীন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তাকে আর বাড়তে দিলে শেষে সিংহাসন রক্ষা করা মুস্কিল হয়ে পড়বে। ইতিগীন নিহত হলে বহরাম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। হয়ত সাক্ষাতে বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে। তা দিক্। তার জন্য সুলতানা তৈরী। সে ভয় করে না।

ওসমান খাঁ কুর্নিশ জানিয়ে বলল, আমি সব বুঝতে পেরেছি সুলতানা। ইতিগীনকে এমনভাবে গুপ্তহত্যা করতে হবে যে রাজ্যের লোক কেউ জানবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি সব ব্যবস্থা তিনদিনের মধ্যে শেষ করব। অশ্বপাল জালাউদ্দীনের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী আপনার সেবায় লাগাবার জন্যে সর্বদা তৈরী। অশ্বপালের ইচ্ছাতেই আমরা কাজে রূপ দিয়ে তার আত্মার কল্যাণ কামনা করব।

ওসমান চলে গেলে রিজিয়া আসমানের কথা ভাবল। আসমানের জন্য সে কাতর হয়ে উঠল। ইতিগীনের মৃত্যুতে আসমানের হৃদয় ছিন্ন হবে এই ভেবে তার মনে দুঃখ হলো। কিন্তু পরক্ষণে মরিয়মের জন্যে—নিজের জন্যে দুঃখিত হলো। মরিয়মেরও হৃদয় ছিল, তারও ছিল। কিন্তু ঐ শয়তান ইতিগীনের জন্য সব গেছে। তাদের দুজনের হৃদয়ের বিনিময়ে যদি আসমানের হৃদয় নেওয়া যায়—অন্তত আল্লা অপরাধ নেবে না। তিন আওরৎ দিওয়ানা হয়ে ফকীরসাহেবের মত দরবারী সুরে গান গাইবে। মন্দ কি? ইতিগীন তারই অনুগ্রহে এই রাজবংশতে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। এখন সে রাজবংশের আত্মীয়। এবার তারই চক্রান্তে এই দুনিয়া থেকে সে সরে যাবে।

রিজিয়া ইতিগীনকে উন্মুক্ত রাজসভায় অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে পারত কিন্তু তাতে রাজন্যবর্গরা বাধা দান করত। যদিও ঘাতক রিজিয়ার কথাই রাখত কিন্তু আমীর-ওমরাহরা প্রতিবাদ করে ইতিগীনের পক্ষাবলম্বন করত।

রিজিয়া গুপ্তহত্যার আয়োজন করল শুধু সাময়িক চাঞ্চল্য থেকে রাজ্যকে বাঁচানোর জন্যে। প্রথমে ইতিগীন, তারপর আলতুনিয়া ও বহরাম। পর পর এদের গুপ্তহত্যা করলে সামনের বিপদগুলো থেকে উদ্ধার পাওয়া সুবিধে হবে। ইয়াকুতের হত্যাকারী এই তিনজন। তিনজনকে হত্যা করতে পারলে ইয়াকুত হত্যার প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হবে। অর্থাৎ রাজ্য পরিচালনায় কোন ব্যাঘাত হবে না।

ওসমান খাঁ ফিরতে লাগল সন্ধানে। ইতিগীনকে কৌশল অবলম্বন করে রাজপ্রাসাদের বাইরে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু তাকে রাজপ্রাসাদের বাইরে নিয়ে যাওয়াই মুস্কিল। সে দিনরাত আসমানের মহলে সুখের মহাসাগরে নেশাড়ীর মত সেরাজী পান করে ফুলের শয্যাগহ্বরে শয়ন করে আছে। সেখানে বাঁদীদের প্রবেশ ছাড়া কোন মরদের প্রবেশ নিষেধ। মাঝে মাঝে অবশ্য বহরামের রঙমহলে রাতের মায়াবিনী মুহূর্তে এক একবার দেখে যায়, কিন্তু সেখান থেকে তাকে বের করে আনা বড় মুস্কিল। আসমানের মহলের খাসবাঁদীকে প্রচুর উৎকোচ দানে বশীভূত করেছে ওসমান, তার দ্বারা কিছু কাজ হওয়া সম্ভব। বহরামের রঙমহলেও যে নর্তকী ইতিগীনকে নিজের যৌবন দিয়ে খুশী করে—তাকেও বশ করেছে ওসমান। সে বলেছে, প্রয়োজন হলে সেরাজী সরাবের সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়ে ইতিগীনের প্রাণনাশ করবে। কিন্তু ওসমান ভাবছে তা করবে কিনা! প্রাসাদের মধ্যে ইতিগীনকে বধ করবে না প্রাসাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে একেবারে গুম করে দেবে। ইতিগীনকে সম্পূর্ণ লোপাট করে দিতে পারলে রাজন্যবর্গের বিস্ময় উৎপাদন হবে। তারা হয়ত অন্যরকম একটা চিন্তা মনের মধ্যে গ্রহণ করে ইতিগীনের অদৃষ্টকে গুরুত্ব দেবে না।

ওসমান ভাবতে লাগল—কি করবে ? কিন্তু সময় বড় অল্প। বেশীদিন অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। হয়ত সুলতানার মত পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। একটা অত্যধিক উত্তেজনায় সুলতানা ইতিগীনকে গুপ্তহত্যার চক্রান্তে মত দিয়েছেন। কোমলপ্রাণা সুলতানা হঠাৎ হয়ত মত পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু ওসমানের ইচ্ছা নয় ইতিগীন এখনও পৃথিবীতে বেঁচে থাকুক। অশ্বপালের অভিপ্রেত ছিল, দুনিয়া থেকে ইতিগীনকে সরিয়ে দেওয়া। কারণ এই শয়তানের চক্রান্ত শেষপর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে পারে।

বহরামের রঙমহলের নর্তকী রোশনীর সঙ্গে পরামর্শ করল ওসমান। যেমন করে হোক ইতিগীনকে কোন কিছুর লোভ জাগিয়ে প্রাসাদের বাইরে আনতে হবে। তারপর দিল্লী থেকে বহুদূর নিয়ে গিয়ে জীবন্ত-কবর।

নর্তকী রোশনী কথা দিল আগামী রাত্রে সে তাই করবে, শুধু যমুনার তটে কেউ যেন তাদের জন্য অপেক্ষা করে। সেখানে পৌছে দিয়ে তার ছুটি।

নর্তকী রোশনী অপূর্ব সুন্দরী। তার দেহের খাঁজে খাঁজে বিজলীর চমক। তার বুকের কস্তুরীবাঁকে সমুদ্র-সফেন উত্তালতা। তার নিতম্বের অপূর্ব গঠনে বহু মরদের হৃদয় চাঞ্চল্য। ইতিগীন বেছে বেছে তার কাব্যমনের প্রেয়সী হিসাবে এই রোশনী যৌবনে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিল। রোশনী যখন রঙমহলের হাজারো বিজলীর সামনে নিজের দেহকে লীলায়িত ছন্দে ঘুরিয়ে নাচত তার দেহের চমকে ইতিগীনের কাম-প্রপীড়িত রক্তের মধ্যে হিন্দোল জাগত। ইতিগীন মুগ্ধ রোশনী-যৌবনে।

সেদিন এমনি নাচতে নাচতে ইতিগীনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে রোশনী কি বলল—বলতে ইতিগীন মাথা নেড়ে বলল, 'প্রয়োজন নেই। তোমার চেয়ে কোন রূপসী তামাম দুনিয়ায় আছে কিনা আমার জানা নেই।' কিন্তু রোশনী ছাড়বার পাত্রী নয়, সেও হেসে ইতিগীনকে বলল—একবার আমার সাথে চল, দেখে চোখ ফেরাতে পারবে না। আমার কথা যদি ঠিক না হয় তাহলে আমাকে যে শাস্তি দেবে তাই আমি গ্রহণ করব। এত রূপ কখনও আমি দেখিনি। কিন্তু সামান্য এক ফকির সাহেবের হেপাজতে সেই রূপ দলিত হচ্ছে। একে যদি তুমি রঙমহলে আনতে পার তাহলে সুলতান বহরাম শাহ তোমার ওপর আরও খুশী হবে। আমি আওরৎ হয়ে আর এক আওরতের সন্ধান দিচ্ছি কেন—আমি তোমাকে বহুৎ পেয়ার করি বলে তোমার সুখই আমি চাই।

মূর্খ ইতিগীন রোশনীর কথাকে বিশ্বাস করে একটি খুবসুরত আওরতের হৃদয় জয় করবার জন্যে বহরামের রঙমহল ছেড়ে সেদিন রাতের অন্ধকারে প্রাসাদের বাইরে রোশনীর সাথে বেরিয়ে পড়ল। দুটি অশ্বে দুজনে আরোহণ করে এগিয়ে চলল তারা যমুনার দিকে। তখনকার রাজ্যে রমণীদের ছিল অদম্য সাহস। রোশনীর ভেতরে উত্তেজনা। সে ভাবছে, যদি ইতিগীন এখনই বুঝতে পারে তার চক্রান্ত, তাহলে তার খাপে পোরা ধারাল ছোরা আমূল বিদ্ধ করে দেবে রোশনীর ছোট্ট বুকে। কোন মায়া বা অনুকম্পা দেখাবে না।

ওসমান তার দলবল নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় অন্ধকারে অপেক্ষা করছে। ঠিক গিয়ে পৌছলে তারা ইতিগীনকে বন্দী করে বহুদূর পাল্লায় চলে যাবে। তারপর ছোরার আঘাতে ইতিগীনের প্রাণবায়ু এই রাতের অন্ধকারে অন্ধকারের সাথে মিশিয়ে দেবে।

ছুটি অশ্বের গতি দ্রুত। ইতিগীন সরাবে অভ্যস্ত। নেশা হলেও মাতাল নয় সে, জ্ঞান তার টনটনে। রোশনীর পাশে পাশে চলতে চলতে কত ভাল ভাল কথা বলল। বলল রোশনীকে অনেক সুখের কথা। অনেক গোপন ইচ্ছাও ব্যক্ত করল। সে সুলতান হলে, সিংহাসনের তখতে বসলে রোশনীকে বেগম করবে। আসমান রোশনীর কাছে কি? শুধু রাজপরিবারের মেয়ে বলে তাকে একটু খাতির করে—না হলে তাকিয়েও দেখত না কখনও। আওরতের শরীর দেখলে দিল ধড়ফড় না করলে সে আওরতকে কোরবানী দেওয়া উচিত। আরও বলল, সুলতানা অবশ্য একজন আস্‌লি আওরৎ। কিন্তু বড় মেজাজ। আওরতের দেহ মরদের ভোগের জন্য। সে দেহে বোরখা পরিয়ে রাখলে তার মূল্য কি?

হঠাৎ যমুনার ধারে একটি চাপ অন্ধকার স্থান থেকে একটি দারুণ চীৎকার উত্থিত হল! ইতিগীন কিছু বোঝবার আগেই একটি কাল কাপড়ের ঢাকনা এসে তাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরল। তারপর কে যেন তাকে জোর করে অশ্বপৃষ্ঠে থেকে নামিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেলল, মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিল, দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। ইতিগীন আর কিছু বলতে পারল না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

ওসমান যখন রোশনীকে ঘোড়ায় তুলে দিয়ে দিল্লী প্রাসাদে ফিরে যাবার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছে, এইসময় আর একটি দ্রুত অশ্বারোহী অন্ধকারের ভেতর থেকে দ্রুত এসে সামনে দিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করল। সামনে আসতে ওসমানের দলের লোকেরা দেখল অশ্বারোহীর সামনে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা একটি মানুষ। অবশ্য মানুষ বলে অনুমান হয়।

ওসমান অশ্বারোহীকে চিনতে পারল না, গর্জন করে শুধু জিজ্ঞেস করল—তুমি কে? তোমার সঙ্গের ওটি কি বস্তু?

অশ্বারোহী অন্ধকারে হা হা করে হেসে উঠল, বলল—দিল্লীর সুলতানা আমার বার্তা শুনে খুশী হয়ে আমাকে ইনাম দিয়েছেন তারই মহলের একটি খুবসুরৎ বাঁদী। আমি দ্রুত ফিরে চলেছি তাকে উপভোগ করব বলে।

কিন্তু বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

আওরৎ চিড়িয়ার মত। যদি উড়ে যায় সেইজন্তে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি। এই বলে আবার সেই অশ্বারোহী নিজের রসিকতায় হেসে উঠল।

ওসমানের দলের লোকেরাও হাসল।

অশ্বারোহী আর অপেক্ষা করল না, সেলাম জানিয়ে দ্রুত অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ওসমানের সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু অশ্বারোহীকে থামাতে তার ইচ্ছা হল না।

কারণ সঙ্গে বন্দী ইতিগীন, তাকে কোতল করতে হবে। এই ইতিগীনকে সরিয়ে দিতে পারলে হয়ত সুলতানা খুশী হয়ে অশ্বপালের পরিত্যক্ত পদটি তাকে দিতে পারে।

তারপর রোশনীকে বিদায় দিয়ে ওসমান ও তার দলের লোকেরা ইতিগীনকে নিয়ে বহুদূর চলে গেল। তারপর গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে কোতল করে মাটির নীচে কোরবাণী দিয়ে ফিরে এল। যখন তারা দিল্লীর প্রাসাদের কাছে পৌছল প্রভাতের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। পাখীর কলরবে চারিদিক ভরে গেছে। সূর্যের প্রথম আলোর স্নিগ্ধপরশ দিল্লীর প্রাসাদের তোরণদ্বারে। কিন্তু ওসমানের বাহিনী নহবতখানার কাছে আসতেই কয়েকজন উত্তেজিত সেনার আলাপ-আলোচনায় তারা থমকে দাঁড়াল। শুনল, গতরাত্রে রিজিয়া ও ইতিগীন প্রাসাদ থেকে অদৃশ্য হয়েছে। ইতিগীনের বিবি বহরাম-ভগ্নী আসমান সুলতানাকে অভিসম্পাত দিয়েছে। সুলতানা ইয়াকুতের মৃত্যুর পর নিজের কামপ্রবৃত্তিকে দমন করতে না পেরে ইতিগীনকে নিয়ে পলায়ন করেছে, আসমানের এই বিশ্বাস।

এদিকে বহরাম শাহ খুশী। সে আমীর-ওমরাহদের সমর্থন নিয়ে রিজিয়ার পরিত্যক্ত সিংহাসনে আজ মাথায় মুকুট পরে বসেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে রাজ্যের। রাজন্যবর্গরা বহরামকে বসিয়ে কোষাগারের সমস্ত ধনরত্নে অধিকার বসিয়েছে।

ওসমান শুধু দলবল নিয়ে হতবুদ্ধির মত নহবতখানার সিংহদরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। ভাবতে লাগল, গতরাত্রে যে অশ্বারোহী তাদের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছিল সেই যে অশ্বপৃষ্ঠে সুলতানাকে কালোকাপড়ের ঢাকনা পরিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে—এ নিশ্চিত। কিন্তু সেই অশ্বারোহী কে? পরক্ষণে ওসমানের মনে একটি কথার উদয় হতে সে দলবল নিয়ে অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে দ্রুত অশ্বচালনা করল। আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে কয়েকটি অশ্ব ছুটে চলল যমুনার ধার দিয়ে। তুর্কী-সেনাদের বর্মের ওপর সূর্যের রশ্মি পড়ে রোশনী ছড়ালো।

ভাতিণ্ডার কারাকক্ষ। তবে এ কারাকক্ষ সাধারণ কক্ষ নয়। কোন রাজন্যকে বন্দী করে রাখবার জন্যে ভিন্নভাবে তৈরী হয়েছে। ঘরের মধ্যে আসবাবের ছড়াছড়ি। ঐশ্বর্যপূর্ণ। বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন মেজাজের মসলিনের ঘেরাটোপ পরানো। কাশ্মিরী ফরাস পাতা ঘরের মেঝেতে। সুদৃশ্য মেহগিনি পালঙ্ক। পালঙ্কে শুয়ে আছে দিল্লীর সুলতানা রিজিয়া। রিজিয়ার পরণে মখমলের শ্বেতপোষাক। রজনীগন্ধার মত শ্বেতশুভ্র বসন পরে রিজিয়া ক্লান্ত অবসন্ন দেহে কাগজ সাদা মুখ নিয়ে শুয়ে আছে পালঙ্কে। সামনেই মেহগিনি টেবিলের ওপর রাখা স্বর্ণপাত্রে আহার্য বস্তু। সে আহার্য বস্তু স্পর্শ করেনি রিজিয়া।

রিজিয়া ভাবছে। অথণ্ড ভাবনার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে সে কূল খুঁজে চলেছে। পরিত্রাণের উপায় ভাবছে না, মুক্তির চেষ্টা না, সে ভাবছে এর শেষ কোথায়? সিংহাসন থেকে তুলে আলতুনিয়া তাকে নিয়ে এসে কারারুদ্ধ করে রাখল। সে দিল্লীর সুলতানাকে নিয়ে কি করতে চায়? তাঁর বাসনা যখন চরিতার্থ হওয়ার কোন পথ নেই তখন সুলতানকে বন্দী করে রেখে তার কি সুবিধে হবে?

ইয়াকুত নেই। ইয়াকুত নিহত হতেই সে বুঝেছে যে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কদিন ধরে মৃত্যুর ছায়া মহলের চারিদিকে ঘুরে ফিরছিল। তার চোখে ঘুম এলেই সে চোখের সামনে দেখেছে পিতার ছায়া। পিতা যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ইয়াকুতের রক্তাক্ত দেহটা যেন কাতর হয়ে তাকে বলছে, সুলতানা মেহেরবাণী করে আমাকে মুক্তি দাও।

ইয়াকুত মুক্তি চাইল কেন? তবে কি ইয়াকুত সুলতানার অত্যাচারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। রিজিয়া ভাবে, হ্যাঁ অত্যাচারই সে ইয়াকুতের ওপর করত। সে নিজেকে ইয়াকুতের কাছে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু ইয়াকুত নেয় নি। ইয়াকুত সুলতানাকে সম্মান করে রক্ষা করেছে। লোভাতুর হয়ে নিজেকে প্রশ্রয় দিয়ে সুলতানাকে ভোগ করে নি। সুলতানার হৃদয়ে এক অসহ মুহূর্তে পাপ ঢুকিয়ে দিয়ে সে আনন্দ আহরণ করেনি। সে মহৎ। তার তুলনা সারা আর্যাবর্তের কোথাও নেই। কোথাও এমন একটি মানুষ পাওয়া যাবে না যে সুলতানার লোভাতুরা দেহের কৌমার্যকে ভোগ না করে ছেড়ে দেবে—সেখানে সুলতানা গররাজী নয়।

আজ ইয়াকুত নেই। আজ ভাবতে পারছে রিজিয়া। সমস্ত তুর্কী সাম্রাজ্যে এমন একটি তুর্কীর দেখা যদি পেত! অথচ সুলতানাকে ভালবাসাও ইয়াকুতের কম ছিল না। নিজে ভিন্নভাবে দল গঠন করে সুলতানাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে। নিজে যতদিন বেঁচে ছিল সর্বদা সুলতানার পাশে থেকে সুলতানাকে বাঁচিয়েছে, সুলতানার সিংহাসন রক্ষা করেছে। তার মৃত্যু এই সুলতানার জন্যেই। আলতুনিয়াকে অতর্কিতে বাধা দিতে গিয়েই তার মৃত্যু হয়েছে। সে মরেনি। সুলতানাকে মেরে গেছে। তার অভাব সমস্ত আর্যাবর্তের চারিদিকে। সুলতানা রিজিয়া ইয়াকুতকে আকাশে বাতাসে খুঁজে বেড়ায়।

ওসমান খাঁ অঙ্গীকার করেছিল ইতিগীনকে হত্যা করবে। কিন্তু তার কোন সংবাদ পাওয়ার আগেই আলতুনিয়া তাকে ধরে নিয়ে এল। আলতুনিয়া তাকে তার খাসমহল থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় চুরি করে নিয়ে এল। খোজা প্রহরীরা তাকে সাহায্য করল। দিল্লীর চারিদিকে বিদ্রোহ, এমনকি প্রহরীরা পর্যন্ত সুলতানার বিরুদ্ধে। বিরুদ্ধে না হলে এমনটি হওয়া সম্ভব ছিল না। সুলতানাকে চুরি করে নিয়ে আসা আলতুনিয়ার ক্ষমতায় হতো না।

যাক সিংহাসন গেছে তার জন্যে ক্ষতি নেই। এই সিংহাসনের জন্ত তার চার বছর ধরে ঘুম হয়নি। সে ভাল করে ঘুমতে পারেনি। এই চার বছর ধরে তাকে সরীসৃপের দংশনে অস্থির হয়ে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। সিংহাসনকে অরক্ষিত রেখে সে কোথাও

গিয়ে শান্তি পায় নি। সর্বদা বিদ্রোহ আর যুদ্ধ। শত্রুদমনে তার এই চারবছরে অনেক ইতিহাস তৈরী হয়ে গেছে। সে রমণী বলে বার বার যোদ্ধারা তাকে আঘাত করতে চেষ্টা করেছে। এখন সে ক্লান্ত। সিংহাসন আর সে চায় না। সিংহাসনের প্রতি মমতা তার আজ লুপ্ত। যে হৃদয়ের বিনিময়ে সে সিংহাসন অধিকার করেছিল সেই সিংহাসন আজ স্বইচ্ছায় ত্যাগ করবে বলে মনস্থ করেছিল। আলতুনিয়া বন্দী করে নিয়ে আসতে স্বইচ্ছায় আর ত্যাগ করতে হল না। পিতা বেহেস্ত থেকে তাকে অভিসম্পাত দেবে, কিন্তু সে আজ বলতে বাধ্য, পিতার দূরদর্শিতা কিছু কম ছিল, কোন রমণী সিংহাসনে বসে রাজকার্য চালাতে পারে না। রমণীকে কেউ শক্তিশালিনী বলে স্বীকার করে না। আল্লার সৃষ্টি তাদের কোমল স্বভাব। পুরুষ তাদের তাই তুচ্ছ জ্ঞান করে। রিজিয়া বহু যোদ্ধাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেছে। অসি-চালনায় সবাইকে চমকে দিয়ে পিতা আলতামাসের সম্মান রক্ষা করেছে। তবু সে তুচ্ছ, তবু তার সম্মান কোন পুরুষ তাকে দেয় নি। একথা যদি আগে সে জানতো, কেউ যদি তাকে রমণী জীবনের মূল আদর্শকে স্মরণ করিয়ে দিতো তাহলে সে কখনই সিংহাসনের জন্য বাসনা মনে পোষণ করতো না।

কিন্তু হায়, কে বলবে সে কথা? আপনার বলতে কে ছিল রিজিয়ার। রিজিয়ার মাইনে-করা কর্মচারী অনেক, অনেক লোক তার তাঁবে হুকুমতামিল করবার জন্যে অপেক্ষামান। কিন্তু আপন কে ছিল? সবাই আড়ালে ছুরি শানিয়ে সুলতানার হৃদপিণ্ড ছিঁড়বার জন্যে তৈরী।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রিজিয়া। এসব কথা কদিন ধরেই ভাবছে। ভাবনার তার শেষ নেই। ভাবনার সময়ও তার অফুরন্ত। সিংহাসন নেই, রাজকার্য নেই, অপরাধীর বিচার নেই—কিছু নেই। শুধু ভাবনা। বহুকাল পরে সুলতানা সমস্ত কর্তব্যের পর অবসর পেয়েছে।

সে আজ হাত-পা ছড়িয়ে জীবনের বাকী দিনগুলির জন্যে মসজিদের দরজায় গিয়ে নমাজ পড়তে পারে। আর অশান্তিময় জীবনে শান্তির জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা জানাতে পারে। সে আজ মুক্ত। সে যা খুশী তাই করতে পারে। সে সিংহাসনের কর্তব্য, রাজ্যের কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

সে বিহঙ্গের মত আসমানের সমস্ত দিকে উড়ে যেতে পারে। তাকে সঙ্গীন তুলে কেউ প্রাণের ভয় দেখিয়ে নিষেধ করবে না। সে দেশ-দেশান্তর ঘুরে তীর্থ করতে পারে। আজমীরের দরগা শরীফের মসজিদে নমাজ পড়তে যেতে পারে; দূরদুর্গম মক্কাশরীফ, পুণ্যভূমি কাবায় গিয়ে জমজমের পানি সারাদেহে ছিটিয়ে, উষর মরুপ্রান্তরে উটের কারোয়ায় বসে দেখতে পারে—পশ্চিম আকাশ ছেয়ে রঙের তুফান, শত দৃশ্য—শত সহস্র স্মৃতির রঙে রঙীন কত অজস্র দিন।

কিন্তু বেহুঁশ মনে কিছুই আর ভালো লাগে না। এই কারাকক্ষের পাষাণ প্রাচীরের অন্ধকার গুহাকোণে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে। আলতুনিয়া তাকে কৃপা করে সাধারণ কারাকক্ষের নোংরা আবহাওয়ায় রাজবংশের দুলালী

কন্যাকে স্থান দেয়নি, দিয়েছে রাজকন্যাকে সম্মান, রাজন্যের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা। কিন্তু কি দরকার ছিল এসব রাজসিক ব্যবস্থার। যে বন্দী সে বন্দী। বন্দীকে সম্মান প্রদর্শন করার প্রয়োজনীতা কি.? অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড সাধারণ ও অসাধারণের তফাত রাখে না। ঘাতকের খড়্গ প্রত্যেকের গণ্ডে গিয়ে একইভাবে পরশ বুলায়। একই শোণিত বেরিয়ে আসে প্রত্যেকের শরীর থেকে। তাই সে অন্ধ প্রকোষ্ঠের কল্পনা নিয়ে বন্দী জীবনের যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে রিজিয়া নিঃশেষ হয়ে যেতে চায়। রিজিয়া আহার্য গ্রহণ করে না, নিরম্বু উপবাসের মধ্যে যন্ত্রণার সপ্তমার্গে উঠে পালঙ্কের শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর আরাধনা করে।

দিন আসে। সূর্য উদয় হয়ে পশ্চিম আকাশে রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়ে তামাম দুনিয়ার মানুষের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। আবার রাত্রি আসে। অন্ধকারের কুহেলী ধরিত্রীকে শয়তানের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নেয়। অন্ধকারে ঘটে যত অলৌকিক ঘটনা। অন্ধকারের শয়তান তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় রক্তপিপাসু হয়ে। সর্প দংশন করবার জন্যে ফণা তুলে অপেক্ষা করে। তারপর চাঁদের মোহিনী মায়া দুনিয়াকে ছেয়ে ফেললে রাতের অপ্সরীরা রোশনীবাগে বসোরাই গোলাপের মধ্যে নৃত্যছন্দে আনন্দ বিতরণ করে।

রিজিয়া কারাকক্ষে বসে এ সবই অনুভব করতে পারে। কিন্তু এ তার সহ্য হয় না। তার মনে হয়, আলতুনিয়া তাকে শত্রু ভেবে বন্দী করে নি, তাকে আদর করে আয়াসের সুযোগ দিয়েছে।

'জেনে রাখ বন্দী তুই, শেষদিন না আসিলে আর,
নাই নাই—আশা নাই খুলিবে যে লৌহ-কারাগার।'

লৌহপাষাণ প্রাচীরের এপারে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটলে যে রিজিয়া পরম শান্তি পেতো। কিন্তু আলতুনিয়া তাকে এই রাজসিক কারাগারে বন্দী করে তার শান্তি কেড়ে নিয়েছে। বন্দীর বন্দীত্বকে ঘৃণা না করে তাকে সম্মান দিয়ে সে রিজিয়ার অশ্রদ্ধা গ্রহণ করেছে।

রিজিয়া কাঁদে না। কান্না তার দু'চোখে নেই। অশ্রুর উৎস কোথায় মুখ লুকিয়েছে কে জানে? পাষাণ হয়ে গেছে সব। পৃথিবীতে যার কেউ নেই তার কান্না অলীক সম্পদ। সহানুভূতি যার নেই তার শোক মূল্যহীন।

আলতুনিয়া তাকে বন্দী করেছে। সম্ভবত বহরাম শাহ্ ও ইতিগীনের প্ররোচনায় এ কাজ করতে এগিয়ে এসেছে কিন্তু তার স্বার্থ, সুলতানার হৃদয়। সুলতানাকে সে শাদী করে আর এক সাম্রাজ্য গঠন করতে চায়।

আলতুনিয়া ছিল তারই অনুগ্রাহী। সেই এই ভাতিণ্ডার সামন্তরাজ করে আলতুনিয়াকে সম্মান দিয়েছিল। জীবন দিয়েছিল। আজ আলতুনিয়া নিজের বাহুবলে ভাতিণ্ডায় আপনাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। কয়েকটি হিন্দুরাজা তার বশ্যতাধীনে। খোক্কর ও জাঠসেনা তার অধীনে। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে আলতুনিয়া। অর্থসম্পদ ও সৈন্যসামন্ত প্রচুর সঞ্চয় করেছে। এ সবই এখানে এসে সংবাদ পেয়েছে

রিজিয়া। লোকটির ক্ষমতা দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেছে। আলতুনিয়ার ক্ষমতা দেখেই আমীর-মালিকরা তাকে ক্ষেপিয়ে সুলতানার বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে। আলতুনিয়ার স্বার্থ সুলতানার হৃদয়। কিন্তু আলতুনিয়া সুলতানাকে বন্দী করে এনে বুঝতে পেরেছে। সে বার বার আক্ষেপ করেছে।

আলতুনিয়া প্রত্যহ আসে এই কক্ষে। সে যখন আসে সে অপরূপ সাজে সেজে আসে। আতরের খুসবু মেখে সে রিজিয়াকে মোহিত করবার চেষ্টা করে। রিজিয়া তার দিকে ফিরেও চায় না। সে বলে: ও মুখ দেখলে পাপ হয়। তুমি চলে গেলেই আমি বাধিত হবো। আমাকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে দাও। তুমি ভুলে যেও না আমি সেদিন পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানা ছিলাম।

রিজিয়া বুঝতে পারে, আলতুনিয়া কষ্ট পায়। কিন্তু উপায় নেই। যে ইয়াকুত-হন্তা তার ক্ষমা সেই। তার এতবড দুঃসাহস কেমন করে হয় যে দিল্লীর সুলতানাকে শাদী করতে চায়!

আলতুনিয়া প্রত্যহ অনুরোধ করে তাকে আহার্যবস্তু গ্রহণ করবার জন্যে কিন্তু রিজিয়া তার কথা কানেই নেয় না। একদিন আলতুনিয়াকে সে অনুগ্রহ দেখিয়েছে, হয়ত তাকে ভালও লেগেছিল তবে ভাল লাগা মানে শাদীর ইন্তেজার নয়। বীরকে শ্রদ্ধা করে সে তাকে অনুগ্রহ করেছে। কিন্তু তার ফল যে এই দাঁডাবে, সে যদি জানতো তাহলে কখনও তাকে শয়তান হতে সাহায্য করত না। ইতিগীন, আলতুনিয়া দুজনেই একজাতের মানুষ। দুজনেই সুলতানার অনুগ্রহ পেয়ে শয়তান হয়েছে।

আরও কতদিন যে কারাকক্ষে বসে কেটে গেল কে জানে? আলতুনিয়া শেষ পর্যন্ত রিজিয়াকে নিয়ে কি করবে ভেবে পেল না। রিজিয়া অনেক দিনপর অসুস্থ হয়ে পড়তে হাকিমের নির্দেশে আহার্য গ্রহণ করেছে। এখনও সে বেঁচে আছে তবে মৃত্যুর দিন গুণছে। সে এখন মৃত্যু ছাড়া কিছু ভাবে না। ইয়াকুতের কাছে পৌছোনোর জন্য সে ব্যাকুল।

হঠাৎ অনেকদিন পর আলতুনিয়া আবার কারাকক্ষে প্রবেশ করল। সেদিন রিজিয়া যেন মরিয়া হয়ে উঠল। সে মৃত্যু চায়। কিন্তু মৃত্যু এই বন্ধ ঘরের মধ্যে আসবে না। তাই তার মুক্তি একান্ত কাম্য। সে আলতুনিয়ার দিকে ফিরে কাতর হয়ে বলল—আজ বাহাত্তর দিন আমি তোমার বন্দিনী, তুমি কি আমাকে মুক্তি দেবে না?

আলতুনিয়াও কাতর হয়ে উত্তর দিল—বলেছি তো তুমি রাজী হও।

আমি রাজী হতে পারবো না।

এই কি তোমার শেষ কথা?

হাঁ।

আমি তোমাকে ভালবাসি।

রিজিয়া ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বলল: আমি তোমাকে ভালবাসি না।

আলতুনিয়ার মুখে ম্লানছায়া নেমে এল, বলল—আমার অপরাধ কি বেগমসাহেবা?

আমি জালাউদ্দীন ইয়াকুতকে হত্যা করেছি, সেইজন্তেই কি তুমি আমার সাথে মহব্বত করবে না ?

কতবার তো বলেছি একই কথা। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। আমি ইয়াকুতের হত্যাকারীকে শাস্তি দেবো বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে আমার কলিজা ছিঁড়ে নিয়েছে, আমিও তার কলিজা সময়ান্তরে ছিঁড়ে নেবার আয়োজন করব।

আলতুনিয়া মাথা নাড়ল, বলল—জানি তুমি সাহসিনী। কিন্তু আমার নিরুপায় অবস্থার জন্তেও কি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার না ? তুমি কি বুঝতে পার না—এ সবেরই মূলে আমার বহুদিনের অর্জিত মহব্বত! যখন শুনতাম, ইয়াকুত নামধারী এক হাবসী ক্রীতদাস তোমার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে ; আর তুমিও তাকে যথেষ্ট ভালবাসো, তখন আর কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। নফরকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমার সিংহাসনের প্রতি কোন লোভ ছিল না, স্রেফ তোমার জন্যে আবার এই শ্রম।

রিজিয়ার মুখের ওপর বিরক্তির ছায়া নেমে এল, বলল—এসব কথা অনেকবারই শুনেছি। আর শোনার স্পৃহা নেই। তবে এটুকু তুমি জেনে রাখ, কোন রমণী কাপুরুষকে শাদী করে না। আমি দিল্লীর সুলতানা হলেও রমণী। রমণী-মনের ইচ্ছাও আমার মধ্যে আছে। ইয়াকুত উন্মুক্ত রাজসভায় সবার সামনে যেমন করে দিল্লীর সুলতানাকে চেয়েছিল, আমি তার অদ্ভুত সাহস দেখেই চমকে উঠেছিলাম। ভালবাসা অনুনয় বিনয় করে আসে না, সে আপন থেকেই আসে। ইয়াকুতের সাহস দেখে আমার মন আপন থেকে তার কাছে ছুটে গিয়েছিল। মনটা এমন করে সে জয় করেছিল যে, সেই রাত্রে বন্দীশালায় সে যদি জোর করে আমার কুমারীত্বটুকু কেড়ে নিত, তাহলেও আমি তাকে বাধা দিতুম না। কিন্তু সে তা করেনি। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে সুলতানাকে সম্মান দেখিয়ে তার রমণী হৃদয়কে অশ্রদ্ধা না করে সে মহব্বতকে উচ্চ সিংহাসনে স্থাপন করে গেছে। বলতে বলতে রিজিয়া চুপ করে গিয়ে উদাস হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। হয়ত ইয়াকুতের মুখটাই তার মনে পড়ে যাচ্ছিল।

খানিকক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ। তারপর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আলতুনিয়া শেষ একবার বলল—তাহলে তুমি কিছুতেই রাজী হবে না ?

রিজিয়া ম্লান হাসল, হেসে বলল—দিল্লীর সুলতানা কখনও এক কথা দুবার বলেছে শুনেছ কি ?

আলতুনিয়া মাথা নত করে রইল। ভাবতে লাগল—সিংহীকে পিঁজরায় পুরে তাকে পোষ মানানো যাবে না। জোর করে তাকে অধিকারও সম্ভব নয়। শাদী করা তো একেবারেই চলবে না। শ্লীলতা হানি করা যেতে পারে। কিন্তু তার সার্থকতা নেই। অথচ ওদিকে তারই সাহায্যে বহরাম শাহ সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসেছে। ভুল করেছে। দারুণ সে ভুল। পরকে সাহায্য করে তার সুবিধে কি হল ? বরং রিজিয়া তাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছে। ভাতিণ্ডার সামন্তরাজের পদ

তারই জন্তে পেয়েছে। সেই রিজিয়ার ওপর সে অত্যাচার করল। ইয়াকুতকে হত্যা করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। রিজিয়াকে বহুদিন ধরে সে কামনা করেছে। তখন সে ফকির। আজ সে উজীরের পদমর্যাদা জয় করে রিজিয়াকে পাওয়ার জন্তে এইসব অন্তায়কে প্রশ্রয় দিয়েছে। দিল্লীর সিংহাসন উচ্ছৃঙ্খল বহরামশাহের হাতে তুলে দিয়ে দারুণ অন্তায় করেছে। ইতিগীন ওসমান খাঁর হাতে নিহত। ইতিগীন আজ নেই। সেই তাকে বিদ্রোহী হবার জন্তে গোপনে প্ররোচনা দিয়েছিল।

ওসমান খাঁ ও তার দলবল আলতুনিয়ার কাছে বন্দী। সেকথা এতদিন ধরে গোপনে রেখেছিল শুধু রিজিয়াকে সিংহাসনের পুনঃপ্রাপ্তির আশা ছাড়ানোর জন্তে। কিন্তু রিজিয়া আর সিংহাসন চায় না। চায় না আর শাসন করতে রাজত্ব। সে নিজেই বলে—সে ক্লান্ত। আলতুনিয়া বুঝে উঠতে পারে না, এ কি করে সম্ভব? যে সিংহাসনের এক সামান্তা রমণী কত সাহসের পরিচয় দিয়ে বার বার সিংহাসনকে উদ্ধার করেছে সে হঠাৎ সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে মুক্তি চায়?

কিন্তু কেন? আলতুনিয়ার কিছুতে বোধগম্য হল না রিজিয়ার আগামীদিনের মতলব। সে যেন ভাবনার অতলান্তে হারিয়ে গেল। রিজিয়ার উদ্ধত ফণা সে বন্দী হতে নামিয়ে রেখেছে কিন্তু উঠতে কতক্ষণ। আলতুনিয়া বেশ ভালভাবেই এই সর্পিণীকে চেনে! এই সর্পিণীকে চেনে উত্তরভারতের যোদ্ধারা। রিজিয়ার অসাধ্য কিছু নেই তাও জানে সবাই। জানে আলতুনিয়া নিজেও।

তাই-সে সর্বদা ভয়ে ভয়ে দিন অতিক্রম করে। ওসমান খাঁকে বন্দী করেছে সম্পূর্ণ অতর্কিতে। সে দলবল নিয়ে তাকে আক্রমণ করবার জন্তে দুর্গের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল; তার যোগ্য সেনারা ধরে ফেলেছে। এখন তারা কারাগারে বন্দীজীবন যাপন করছে। তার কাছ থেকেই শুনেছে ইতিগীনের হত্যার কাহিনী। ইতিগীন নিঃশেষ হয়ে গেছে ওসমানের ছোরার আঘাতে। আরও শুনেছে—রিজিয়া নিযুক্ত করেছিল ওই ওসমানকে ইতিগীনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্তে। ওসমান অবশ্য এসব গোপন কথা প্রকাশ করতে চায়নি, আলতুনিয়া জোর করে আদায় করেছে।

ইতিগীন মারা গেছে তার জন্তে আজ খুশী হয়েছে আলতুনিয়া। ঐ শয়তানই তাকে উত্তেজিত করে করে রিজিয়ার বিরুদ্ধে লাগিয়েছে। না' হলে এত তাড়াতাড়ি হয়ত ইয়াকুত নিহত হত না। ইয়াকুতকে হত্যা করে সুলতানার কাছে সে ছোট হয়ে গেল। সুলতানার কাছে বেইমান নাম নিয়ে সে বীরত্বের সুনামকে ম্লান করে ফেলল। সুলতানা আজ ক্ষুব্ধ, শুধু ইয়াকুতের হত্যাকারী ভেবে।

বহরাম শাহ আজ দিল্লীর সিংহাসনে বসে তোষাখানা খুলে দিয়েছে আমীর-মালিকদের জন্য। তারা দুহাতে লুঠে নিয়ে যাচ্ছে দিল্লীর ধনরত্ন। আলতামাসের ও রিজিয়ার ক্ষমতায় যে ধনরত্ন দিল্লীর তোষাখানায় সঞ্চিত হয়েছিল, উচ্ছৃঙ্খল বহরাম শাহ তা লুটিয়ে দিচ্ছে রাজন্তদের কাছে। তারা সকলে লাভবান হয়ে মজা লুটছে, আর সে বেইমান নাম নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার ছাপ দেহে নিয়ে রিজিয়ার কাছে অপমানিত হচ্ছে।

উত্তেজনার বশে ইতিগীনের প্ররোচনায় একটা বিরাট অন্যায় করে এখন সে অনুতপ্ত। কিন্তু অনুতপ্ত হলে এর প্রতিকার কি? রিজিয়া তাকে শাদী করবে না। শাদী করলে না হয় বিবির হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের আয়োজন করা যেত। নতুন সুলতান মুইজুদ্দিন বহরাম শাহর অধীনতা পাশ ছিন্ন করে মালিক ইজ্জ-উদ্দীন্ মুহম্মদ সালারী ও মালিক করাকুশ ভাতিণ্ডায় এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের মুখ থেকেই শোনা বহরাম শাহর অত্যাচারের নমুনা। সে সিংহাসনে বসে রিজিয়ার খাসমহলের সবকটি বাঁদীকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়েছে। কারণ রিজিয়ার কোন চিহ্নই সে রাজ-পরিবারে রাখবে না। মন্ত্রী ও সেনাপতিকে বরখাস্ত করে নবনিযুক্ত মন্ত্রী ও সেনাপতি বহাল করেছে। প্রথমে তারা জানতো, রিজিয়া ইতিগীনকে নিয়ে ফেরার হয়েছে। তারপর জানতে পারল তারা ভাতিণ্ডায় আলতুনিয়ার কাছে গিয়ে উঠেছে। তারপর জানতে পারল—আলতুনিয়া ইতিগীনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। বহরাম শাহ এখন আলতুনিয়ার ওপর দারুণ ক্ষিপ্ত। সে সৈন্য তৈরী করেছে ভাতিণ্ডার আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে। তার স্থির বিশ্বাস—রিজিয়া সিংহাসন উদ্ধারের জন্য আলতুনিয়ার সাহায্যে আক্রমণ চালাবে।

এসব কথা রিজিয়া এতটুকু জানে না। আলতুনিয়ার ইচ্ছা ছিল, যদি রিজিয়া শাদীর মত দেয় তাহলে সে সব অকপটে বলবে কিন্তু রিজিয়ার মেজাজের হদিশ না পেয়ে সে সংবাদ গোপন করে আছে। তার দুশ্চিন্তা—যদি রিজিয়া এসব কথা শুনে এই কারাকক্ষে বসেই চক্রান্ত করতে শুরু করে! তখন নিজেকে বিপদ মুক্ত করা আলতুনিয়ার সাধ্যের বাইরে হয়ে পড়বে। কিন্তু আজ মনে হলো এসব সংবাদ রিজিয়াকে দিলে মনে হয় শীঘ্র কোন ফল হবে। হয়ত রিজিয়া সিংহাসনের জন্য তাকে শাদী করে দিল্লীর আক্রমণে মত দিতে পারে।

তাই আলতুনিয়া খোদার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে রিজিয়াকে গত ক'দিনের আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা পরিবেশন করল, এতটুকু সে গোপন করল না। সে এখন মরীয়া। একদিন দিল্লীশ্বরী তাকে কৃপা করেছিল, তার অনুগ্রহে আলতুনিয়ার ভাগ্য ফিরেছে। আর তাকেই বিশ্বাস করে তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

রিজিয়া যেন সমস্ত ঘটনা শুনতে শুনতে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠতে লাগল। তার সাজানো রাজ্য আজ তার বৈমাত্রেয় ভাই ছারখার করে দিচ্ছে। এ যে তার সহ্যের অতীত। সে এখনও কেমন করে স্ব-কর্ণে শুনছে? শুনে কেমন করে সহ্য করছে? খোদা এখনও তাকে কেন জীবিত রেখেছে। তার রক্ত দিয়ে গড়া রাজ্য আজ অপরে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

আলতুনিয়া ক্ষমা চেয়ে বলল—সুলতানা, বহুৎ অন্যায় আমি করেছি। আমার অন্যায়ের ক্ষমা নেই, তবু এই শেষবারের মত আমাকে ক্ষমা কর। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে দিল্লী পুনরুদ্ধারের আয়োজন করব।

রিজিয়া মনে মনে কি যেন ভাবল, তারপর বলল—কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ইয়াকুতের হত্যাকারীকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব।

দিও। আমি শাস্তি মাথা পেতে নেব, আর তার আগে আমাকে তোমার সিংহাসন উদ্ধার করতে দাও, যে সিংহাসন থেকে আমি তোমাকে নামিয়ে এনেছি।

রিজিয়া চুপ করে থেকে আরও যেন কি ভাবতে লাগল—তারপর বলল—আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও। সিংহাসন আমি আর চাই না বলেই মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম কিন্তু যে সিংহাসনকে সুরক্ষিত করবার জন্যে পিতা তাঁর পুত্রদের না বসিয়ে আমাকে বসিয়েছিলেন, সেই সিংহাসন আজ এক কক্কুটের হাতে পড়ে নষ্ট হচ্ছে দেখে আমি অস্থির হয়ে উঠছি।

কিন্তু ভাববার সময়ও আর নেই। মনে মনে রিজিয়া অস্থির হয়ে উঠল সিংহাসনের জন্য। গতকাল সে মনে করেছিল সিংহাসনের আশা সে ত্যাগই করবে। যে সিংহাসনের জন্য সে হৃদয়কে বদ্ধ করেছে সে সিংহাসন তার কাছে অভিশপ্ত। পিতা তাকে এক অভিশপ্ত সিংহাসনের রক্ষিণী করে তার জীবন বিষময় করে দিয়ে গেছে।

কিন্তু ইয়াকুতও তাকে এই সিংহাসন রক্ষার জন্যে সর্বদা বলেছে। বলেছে, তুমি যদি সিংহাসন রক্ষা করে সুলতানার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ না রাখ, তাহলে তোমার বিশেষত্ব কি? তুমি কি উত্তর ভারতের সাধারণ এক রমণী হয়ে ঘরের কোণে পর্দানশীনা হয়ে বাস করতে চাও? তুমি যে লাখো লাখো আওরতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা—এ কথা ভুলে যাও কেন?

আজ নিহত ইয়াকুতের মহব্বতের সম্মান জানাতে গেলে আবার সিংহাসন জয় করতে হবে। একদিন পিতার অনুরোধ রক্ষার্থে সিংহাসনে আরূঢ়া হয়েছিল, আজ প্রেমাস্পদের প্রেমকে শ্রেষ্ঠত্ব জানাতে গেলে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করা উচিত। ইয়াকুত হয়ত আসমান থেকে তাকে আশীর্বাদ জানাবে।

কিন্তু প্রশ্ন—আলতুনিয়াকে শাদী করা। ইয়াকুতকে ভুলে আলতুনিয়াকে শাদী করতে যে দিলের ইচ্ছা জাগে না। ইয়াকুত হৃদয় না চেয়ে মহব্বত জানিয়েছিল। তার মহব্বত ছিল কোরা-আন-শরীফের মত পবিত্র। বেহেস্তের স্বর্গীয় অনুভবের মত সুগন্ধময়। তার স্পৃহা ছিল না। আকাঙ্খা ছিল না। দেহের কোন চাহিদাই ছিল না। এমন একটি মানুষকে ভুলে সে কেমন করে আলতুনিয়াকে শাদী করবে? কিন্তু তবু করতে হবে। সিংহাসনের জন্য। আজ যখন ইয়াকুত এ জগতে নেই তখন সাহায্যের জন্যও নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। ইয়াকুত থাকলে অবশ্য সে আর কারুরই অবলম্বন চাইতো না।

তারপর সানাই বেজে উঠল ভাতিণ্ডার দুর্গে। শাদী হলো কোন রাজসিক উৎসবের আড়ম্বরে নয়। মামুলী এক মেহমানের শাদীর মত অল্প আয়োজন করে দিল্লীশ্বরীর সাথে আলতুনিয়ার পরিণয় হয়ে গেল। অবশ্য উৎসবের যেটুকু প্রয়োজন সবই হল। সরাবের পেয়ালা ভরলো সবচেয়ে সেরা সুন্দরী বাইজী। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ গায়ক গান ধরলো। দামী ফরাসের ওপর নরম পায়ের ছন্দবদ্ধ তালে ঘুঙুরের রুমুঝুমু ধ্বনি উঠল। হাজারো বাতি নয় লাখো লাখো বাতির রোশনাইতে দিল্লীর সুলতানার মুখ আরও উজ্জল হয়ে উঠলো। এ সংবাদ দিল্লীর

প্রাসাদে গিয়েও পৌঁছল। রিজিয়ার বৈমাত্রের ভাই বহরাম শাহ ভগ্নীর বিবাহে মূল্যবান খানদানী যৌতুক পাঠিয়ে দিল।

উৎসব শেষ হয়ে গেল। শাদীর পরদিনই মধুযামিনী উপভোগ করবার আর ফুরসৎ গ্রহণ করল না নবদম্পতি। ওসমান খাঁ, মালিক ইজ্জউদ্দীন, মুহম্মদ সালারী, মালিক করাকুশ খাঁর সহায়তায় নিকটবর্তী জাগীরের কয়েকজন আমীরের সাহায্যে তারা দিল্লীপথে রওনা হল।

তাড়াতাড়ি করবার কারণ ছিল। বহরাম শাহ প্রস্তুত হবার আগে দিল্লী আক্রমণ করলে সহজেই সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ করে সিংহাসন অধিকার করতে পারবে। কিন্তু গুপ্তচরের মুখে বহরাম শাহ সংবাদ পেয়ে দিল্লীর অনেক আগেই সুলতান-সেনা পাঠিয়ে এদের বাধা দান করল। দিল্লী থেকে একশো মাইল দূরে কর্ণালের কাছাকাছি সুলতান-সেনার সঙ্গে এদের সংঘর্ষ হল। সুলতান-সেনা লাখ লাখ আর আলতুনিয়ার সেনাবাহিনী তার চেয়ে অল্প। তার মধ্যে বিশেষ করে খোকুর ও জাঠরা বেশী ছিল। দিল্লীর সুলতান সেনার হাতে পরাজিত হয়ে নবদম্পতি পলায়ন করল। কইথাল পর্যন্ত সৈন্যরা দম্পতির সঙ্গে অনুগামী হয়েছিল হঠাৎ তাদের পথের উপর ত্যাগ করে সৈন্যরা অদৃশ্য হয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে সালারী, করাকুশ ও ওসমান নিহত হয়েছিল।

নিরাশ্রয় নবদম্পতি পথে দাঁড়িয়ে রইল হতবুদ্ধি হয়ে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত সুদীর্ঘ পথ। মরুকান্তারলীন, সুদুর্গম। আসমানের প্রখর সূর্যতাপে পায়ের নীচের বালুকারাশি উত্তপ্ত। কোথায় যাবে? ক্ষুৎপিপাসায় কাতর পথশ্রমে অবসন্ন, দেহ নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ। পরাজয়ের কালিমা মুখে মেখে আলতুনিয়া রিজিয়ার হাত ধরে এগিয়ে চলল। তাদের বাঁচতে হবে। আবার তাদের সৈন্য যোগাড় করতে হবে। আবার দিল্লী আক্রমণ করতে হবে। বহরাম শাহর হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নিতে হবে।

রিজিয়া শক্তিহীনা হয়ে আর পথ চলতে পারল না। আলতুনিয়া তাকে সাহস দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। রিজিয়ার ভেতরে উত্তেজনা জাগিয়ে তুলল। ভবিষ্যতের স্বপ্নে তাকে আবার রাঙিয়ে তুলল। আশাবাদিনী রিজিয়ার মনে আবার সিংহাসন প্রাপ্তির আশা জাগিয়ে তুলল।

কিন্তু আলতুনিয়া নিজেও জানে না, পথ কোথায়? কি করে আবার তারা সৈন্যসমাবেশ করবে, দিল্লী আক্রমণ করবে? সামান্য আশ্রয়টুকু দিয়ে কেউ যদি তাদের সাময়িক বাঁচবার স্বাধীনতা দিত।

জঠরের জ্বালা, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। একটু ছায়াতলে বসে অবসন্ন মনকে যদি কেউ শ্রান্ত করবার আয়োজন করে দিত। একজন দিল্লীশ্বরী, যার আশ্রয়ে লাখো লাখো লোকের আশ্রয়, অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল। সেই দিল্লীশ্বরী আজ একটু আশ্রয়ের জন্যে স্বামীর হাত ধরে মরুপ্রান্তর দিয়ে অবসন্ন দেহে হেঁটে চলেছে। আর একজন ভাতিণ্ডার সামন্তরাজ, যে নিজের বাহুবলে অফুরন্ত ধনসম্পদ নিজের দুর্গে সঞ্চিত রেখেছে। সে দিল্লীশ্বরীর আজ সঙ্গী।

তবু চলেছে তারা পথ। চলেছে আশায় ছলনায় ভুলে। যদি কেউ অন্ধকারে আলো দেখিয়ে তাদের পথ বলে দেয়। তাদের আশ্রয় দিয়ে, শান্তি দিয়ে তাদের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্তে সাহায্য করে।

রিজিয়া কোরা-আন-শরীফের মর্মকথাগুলি মনে মনে উচ্চারণ করল। খোদার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলল—হে মেরে খোদা, তোমার যা মনের ইচ্ছা তাই করো, তবু আমাদের এই দুর্গম পথের শেষ করে দিয়ে আশ্রয় পাইয়ে দাও। জীবনের সমস্ত কালই রিজিয়া কোর-আন শরীফের কথা, আল্লার কথা স্মরণ করেছে। স্বপ্নেও কখনও সে অন্যায় করেনি। রাজপরিবারের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে সে নিজের জীবনকে ফুলের মত পবিত্র করে রেখেছিল, কখনও স্পর্শ করতে দেয় নি মালিন্য। ইয়াকুতকে দেখে যদি বা তার ঘুমন্ত যৌবনের আকাঙ্খা জেগে উঠেছিল, ইয়াকুত তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বেহেস্তের অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করিয়েছে। সেইজন্তে ইয়াকুত আজও তার কাছে শ্রদ্ধেয়।

রিজিয়ার প্রার্থনায় বোধহয় আল্লা খুশী হয়েছিলেন সেইজন্যে তাদের মিলিয়ে দিলেন একটি আশ্রয়। একটি হিন্দু-জমিদারের এক্তিয়ারে তারা আশ্রয় পেল দুজনে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা জমিদাবের বাড়ীতে সম্মানীয় সমাদর পেয়ে প্রবেশ করল কিন্তু পরদিনের সূর্যোদয়ের আগেই দুটি অমরজীবনের মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হয়ে গেল। অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সেই জমিদার মহাশয় রাতেব অন্ধকারে এদের হত্যা করলেন।

দাসবংশের শ্রেষ্ঠা সুলতানা 'রজিয়ৎ-উৎ-দুনিয়া-ওয়া-উদ্দীন' এমনি নিষ্ঠুরভাবে এক অচেনা অজানা জায়গায় অপরের ছুরিকাঘাতে নিহত হল। কি শোচনীয় এর শেষ পরিণাম। সিংহাসনে বসে যে রমণী পৃথিবীর সব কিছুকে একদিন তুচ্ছ করেছিল, যার ভয়ে সমস্ত ভারতের সামন্তরা হৃদকম্প, তার মৃত্যু এক নাটকীয় ঘটনার ভেতর দিয়ে সমাপ্ত হয়ে গেল।

খোদা, মেহেরবান সকলে জানে। খোদাকে ডেকে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানেরা মুক্তি চায়। রিজিয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত খোদার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে নিজে রাজকার্য চালিয়েছে কিন্তু তার শেষ পরিণতি কি এই ?

দিন আবার আসে, সূর্য পূর্ব গগনে তার অপূর্ব জ্যোতিঃপ্রবাহ নিয়ে উদয় হয়। তারপর দিনান্তের শেষে আসে অন্ধকার। অন্ধকারের কালো রূপ গগন থেকে অপসারিত হয়ে চাঁদের রোশনী আসমানের বুক আলো করে আসে। তেমনি দিন ও রাত্রি আবার ঘুরে ঘুরে তারা বছরের পর বছর এগিয়ে চলে।

কিন্তু ঐ কুতুবমীনার। যা আজও দাসবংশের অস্তিত্বকে জাগিয়ে রেখে শ' শ' বছর ধরে বেঁচে আছে। যাকে দেখে দেখে আজিকার মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই কুতুবমীনারের অস্তিত্বকে স্মরণ করতে গেলে তারই সমসাময়িক কালে সুলতানা রিজিয়াকেও স্মরণ করতে হয়। একটি রমণী সমস্ত পুরুষের বীর্যকে অপমান করে নিজের বাহুবলে বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হয়েছিল। রিজিয়াকে মনে এলে মনে পড়ে কবির একটি বাণী :

'অশ্বারোহী, অবহেলে বাম করে বল্গা
ধরি, দক্ষিণেতে শরাসন, নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মত, আর্ত প্রজাগণে
করিয়াছেন বরাভয় দান * *
মুক্তলজ্জা, ভয়হীনা, প্রসন্নহাসিনী।'

আল্লার কাছে শুধু প্রার্থনা জানাতে ইচ্ছা করে—হে খোদা, মেহেরবান, দুনিয়াব মালিক, তুমি সেই ভাগ্যহীনা তুর্কীরমণী রিজিয়ার জীবনে-শান্তি দিও। সে কোন অপরাধিনী নয়। পৃথিবীর কত হারানো রমণী কলঙ্কিতা হয়ে তোমার দয়ার পথ খুঁজে পেয়েছে। আর যে সত্য, প্রেম, ধর্মকে আজীবন গ্রহণ করে এসেছে তার শেষ জীবনে তাকে এমনি শাস্তি দিলে কেন? তবে কি বুঝবো, সে তোমার অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হয়েছিল?

কিন্তু ঐ যে আকাশে লাখো লাখো নক্ষত্রের মাঝে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটে আছে, ঐ কি সেই পবিত্র রমণী আলতামাস-কন্যা রিজিয়ার পবিত্র মনের উজ্জ্বলতা নয়? জানি না, রিজিয়ার অশান্তিময় আত্মা আজ কবরের মাটির তলায় শুয়ে ছটফট করে কি না?